মধুরতা, নির্ম্মলতা, শান্তি-নিকেতনের আনন্দ আস্বাদন করিল—তখনই বলিয়া উঠিল, 'আহা! আমাদের মধ্যে যদি এমন কাহাকে পাওয়া যায়, যে আমাদের ভ্রাতৃগণকে এই সংবাদটি দেয় যে আমরা স্বর্গে রহিয়াছি; যেখানে কষ্ট নাই—যুদ্ধ নাই বিপদ নাই!' অতঃপর যাঁহার নাম অনন্ত কাল কীর্ত্তিত হইবার যোগ্য, তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমাদের প্রীতির অনুরোধে, তোমাদের ভ্রাতৃগণের নিকট আমি এই সংবাদ প্রদান করিব'; এই নিমিত্তই সেই মহান্ ঈশ্বর এই রূপ বলিয়াছেন যে যাহারা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে মৃত না মনে করিয়া, প্রত্যুত জীবন্তই মনে করিবে" (১)।

মহম্মদ আরও বলিয়াছেন; "যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত যুদ্ধ করে নাই কিম্বা আপনার অর্থ দরিদ্রদিগের সহিত বিভাগ করে নাই অথবা এই দুই শুভ কর্ম্ম হইতে অন্যকে পরামর্শ দ্বারা বিরত করিয়াছে, সে একেবারে নরকাগ্নির মধ্যে নিপতিত হয়; শেষ বিচারের দিনে উপস্থিত হইবারও তাহার অপেক্ষা থাকে না।" "দুই প্রকার চক্ষু আছে, যাহা নরকাগ্নি কখন দগ্ধ করিতে পারে না; যে চক্ষু ঈশ্বরের ক্রোধ ধ্যান করিয়া অশ্রুপাত করে ও যাহা ঈশ্বরের যুদ্ধে মুদ্রিত হয়।" "যিনি ঈশ্বরের যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়েন, তিনি কখন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেন না প্রত্যুত যে রূপ অকস্মাৎ কোন সম্পদ লাভ হইলে মনের ভাব হয়, তৎকালে সেই রূপ তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে"; "যে কেহ ঈশ্বর-উদ্দেশে প্রাণ দান করে, সে মলিনত্বে পূর্ণ হইলেও তাহার শেষ দিনে নিশ্চয় সে মৃগনাভি স্বরূপ হইবে" "আর যে কেহ ঈশ্বরের উদ্দেশে যুদ্ধ করে নাই অথবা যুদ্ধ করিব এই রূপ মনেও করে নাই, সে নিশ্চয় অন্তিম কালে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে (২)।"

অতএব দেখা যাইতেছে, যে মুসলমানদিগের চক্ষে, ঈশ্বর-উদ্দেশে যুদ্ধ করাই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। ইহাই তাহাদিগের যাবৎ কার্য্যের নিয়ামক। মহম্মদ বলেন যে "পঞ্চাশৎ বৎসর মক্কায় তীর্থ দর্শন করা অপেক্ষা এক ঘণ্টাকাল ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ করা অধিক পুণ্য কর্ম্ম"—"মনুষ্য-মণ্ডলী মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন বিসর্জ্জন করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে কর্ত্তব্য সাধন করে"—"সমস্ত মাস উপবাস, প্রভৃতি কঠোর ব্রত পালন করা অপেক্ষা যে কেহ এক রাত্রি কাল, এই ধর্ম্ম যুদ্ধে অশ্বারূঢ় থাকে, সে অধিক পুণ্যের কাজ করে. এবং যদি সে ঐ রাত্রের মধ্যে নিহত হয়, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ সফল হয়; এবং সে দুঃখ শোক সন্তাপ অতিক্রম করে"। "যাহারা সপ্ততি বৎসর দেবালয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করে তদপেক্ষা, যাহারা ঈশ্বরের যুদ্ধে যাত্রা করে, তাহারা অধিক পুণ্য সঞ্চয় করে।" "যদি তুমি ঈশ্বরের ক্ষমা অভিলাষ কর এবং তোমার স্বর্গে গমন করিবার ইচ্ছা থাকে —তাহা হইলে—চল—ঈশ্বরের জন্য যুদ্ধ কর, যে হেতু এই ধর্ম্ম-যুদ্ধে যে কেহ একটি উষ্ট্রীকেও কিঞ্চিন্মাত্রও আহত করিতে পারিবে—সে স্বর্গ প্রাপ্তির উপযুক্ত হইবে(৩)"।

অতএব দেখা যাইতেছে মুসলমান ধর্ম্মের প্রথমাবধিই, যুদ্ধই ভক্ত মুসলমানদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। মহম্মদ প্রথম এই যুদ্ধের ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমরোৎসাহ স্বভাবতই কালক্রমে শীতল হইয়া গেল; মুসলমান পণ্ডিতেরা, এই যুদ্ধ নিয়মটিকে, তাহাদিগের

(১) Tahfut-ul Majabideen-P 38.

(২) Do-P 42.

(৩) Do-P 44.

সময়ের উপযোগী করিয়া লইলেন—তাঁহারা বলিলেন মুসলমানদিগের শুদ্ধ এক জন অবিশ্বাসীর সহিত যুদ্ধ করিলেই যথেষ্ট, তাহা হইলেই এই যুদ্ধ স্থায়ী বলিয়া গণনীয় হইতে পারিবে।

ধর্ম্ম বিষয়ে, মুসলমান ও অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধই এক মাত্র সম্বন্ধ। মুসলমানেরা বলে যে "প্রলয় কাল ভিন্ন এই যুদ্ধের শেষ নাই। ঈশ্বরের যুদ্ধ সত্য ধর্ম্ম ব্যতীত আর পৃথিবীর তাবৎ পদার্থই ধ্বংশ হইবে"।

মুসলমান ধর্ম্মের এই মূল সূত্রটি হইতে রাজনীতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি গুরুতর ফল প্রসূত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কতকগুলিন মুসলমান জাতিদিগের স্বদেশীয় শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আর কতকগুলিন বিজাতীয়দিগের প্রতি, ব্যবহার সম্বন্ধে। এ বিষয় অবকাশ মতে পরে আলোচনা করা যাইবে।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৩১ পৃষ্ঠার পর।

সংপু হইতে লম্লুং তিন ক্রোশ, লম্লুং হইতে সাগ্ দুই ক্রোশ, সাগ্ হইতে লপ্থেল তিন ক্রোশ। এই লপ্থেলে অতি বিস্তীর্ণ এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে, ঐ পর্ব্বতের নিম্ন দেশে বিস্তর সালগ্রাম শিলা পতিত রহিয়াছে, ঐ সালগ্রাম শিলা-রাশীর উপর দিয়া গমনাগমন করিতে হয়। এখানকার লোকেরা কহে যে এই সকল শিলার মধ্যে স্বর্ণ আছে। এই কথার পরীক্ষার্থ আমি কয়েকটা সালগ্রাম শিলা ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র স্বর্ণ নাই, কেবল মৃত কীটের অস্থির চিহ্ন তন্মধ্যে প্রস্তরময় হইয়া রহিয়াছে। কোন কোনটার মধ্যে ঝিনুক, শামুক, গুগলি বা মৎস্যাদির মৃত শরীরের প্রস্তরময় চিহ্নও দেখিতে পাইলাম। এখানকার লোকেরা জানে না যে এই সকল শিলার পূজা করিতে হয়। এই পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশস্থ গহ্বরে গন্ধকের খনি আছে, তন্মধ্যে পক্ষি প্রভৃতি কোন ক্ষুদ্র প্রাণী পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। ভোট দেশীয় লোকেরা এই স্থান হইতে গন্ধক লইয়া গিয়া নানা স্থানে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহার কিয়দ্দূরে একটি স্বর্ণের খনি আছে। ঐ খনি হইতে যাহারা স্বর্ণ উত্তোলন করে, তাহারদিগকে ঠিকাদার কহে, ঠিকাদার ভিন্ন অন্য কেহ তথা হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করিতে পারে না। এখানে শীশার খনিও আছে, অন্বেষণ করিলে ইহার ইতস্তত স্ফটিক প্রভৃতি অন্যান্য নানা প্রকার খনিজ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানকার কোন কোন প্রস্তরময় প্রদেশে হিম জমিয়া এক প্রকার শুভ্র প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থ হয়, তাহাকে হিম-ফুল কহে; ঐহিম-ফুল ঘর্ষণ করিয়া দিলে গাত্রের ফুলা রোগ শান্তি হয়।

লপ্থেল হইতে টপিচোঙ্গা তিন ক্রোশ, টপিচোঙ্গা হইতে উটাধুরা দেড় ক্রোশ। এই সকল দেশ যাহা বর্ণিত হইল, ইহাকে কিম্পুরুষ বর্ষ কহে। এই উটাযুরা হইতে পুনরায় ভারত বর্ষে আসিবার উৎকৃষ্ট প্রশস্ত পথ আছে।

To

The Editor of the Tattwabodhini Patrika.

Dear Sir.

Professor Max Muller of Oxford, in his address to the International Oriental Congress lately held in London, remarked that the cause why the Brahmos renounced their belief in the infallibility of the Vedas was the endeavours of Oriental scholars to bring those mysterious books to the knowledge of the public by means of translations. Miss S. D. Collet lately contradicted the statement in the public prints alleging that the true cause of the said renunciation was the discovery of errors in the said books by the Brahmos after the return in 1845 of the scholars deputed by them to Benares to study them. I am an Adi Brahmo. My connection with the Brahmo Samaj began in the commencement of the year 1846. I have every reason to corroborate the truth of Miss Collet's statement. The only circumstance that led to the said renunciation was our setting ourselves to study the Vedas as a sacred

duty, they being believed by us at the time to be the infallible basis of our faith. As we studied them with the aid of the scholars deputed to Benares after their return from that city, we found out inconsistencies and errors in them and thought it impossible to maintain the doctrine of their infallibility. I distinctly remember Babu Debendra Nath Tagore one day told me at the time: "We can no longer conscientiously maintain the Vedas to be a revelation".

I avail myself of this opportunity to inform the public, that we never believed the Vedas to be a revelation in the same sense in which the Christians believe the Bible to be such. We believed the Vedas to be a revelation solely on account of the "reasonableness and cogency of the doctrines taught in them" (See Vedantic Doctrines Vindicated, page 29.) We rejected the idea of a revelation supported by external evidence. "The only ground" we said, "on which the truth of any system of belief can be maintained is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it." (Ibid, page 35). "If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the Sacred Volumes referred to appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them—the man who has received them and continues to place his trust in them will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion." (Ibid p. 29) "The knowledge derived from the sources of inspiration deals with eternal truths which require no other proof than what the whole creation and the mind of man unperverted by fallacious reasonings afford in abundance." (Ibid p. 35.)

For people in the state of mind indicated by the above extracts, renunciation of their belief in the revealed character of their Scriptures is easy. Had we believed that the revelation of the Vedas was supported by the external evidence of miracles, we would have tried our best to maintain the doctrine of Vedic infallibility by arguments as refined as those which Christian clergymen adopt to maintain the revealed character of the Bible putting such interpretations on passages as they do not admit of, thinking that, when there is miraculous evidence, the Vedas must be true and that the word of God must have another meaning than what was at first attributed to it if the latter be found to militate against common sense and truth. But we did no such thing. The moment we found out errors and inconsistencies in the Vedas and thought the doctrine of their infallibility to be no longer tenable, we renounced our belief in the same.

In conclusion, I beg to state that, though we should have called our faith at the time Vedaism as remarked by one of your contemporaries while commenting on this controversy, we preferred the name Vedantism or the religion inculcated in the Vedant or Upanishads as the latter constitute the sum and conclusion of the Vedas and treat more than the other divisions of those books of the One True God, correct knowledge of whom it was our principal object to diffuse among our countrymen.

Calcutta, 24th Novr, 1874. } Yours truly Rajnarain Bose.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সপ্তদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শনিবার পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসের সংখ্যা অবধি পুনর্ম্মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব হইতেছে। যাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন,তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইবেন। ১২ সংখ্যার মূল্য অগ্রিম ৩৲ টাকা ও প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০ আনা। টাকা প্রেরণের বিজ্ঞাপন দিলে গ্রাহক মহাশয়েরা টাকা পাঠাইবেন। এক্ষণে তাঁহারা কেবল তাঁহাদিগের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত "সেকাল আর একাল" আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। মূল্য ৷০ আনা। ডাক মাসুল /০ আনা।

সম্বাদ।

বিগত ৯ কার্ত্তিক রবিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

উক্ত উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকাল ও সায়ংকালের উপাসনার জন্য কয়েকটি প্রেম-পূর্ণ অভিনব সংগীত সংরচিত হইয়াছিল। তত্রত্য ব্রাহ্মগণ সে দিন সাধ্যানুসারে কতকগুলি দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অন্ন বস্ত্র প্রদান প্রভৃতি সৎকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৭১ /১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩০১।৶
সমষ্টি	৩৭২॥১৫
ব্যয়	৮৫ (১০
স্থিত	২৮৭॥৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৸৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১১॥৶
পুস্তকালয়	১০৸৶
যন্ত্রালয়	৪৩
গচ্ছিত	২৸১০
সমষ্টি	৭১ /১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪৪।০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৮ / ৫
পুস্তকালয়	১৶১০
যন্ত্রালয়	॥/১৫
গচ্ছিত	৸৶
সমষ্টি	৮৫ (১০

দান প্রাপ্তি।

দানাধারে প্রাপ্ত	২৸৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা।
সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ পৌষ মঙ্গলবার।

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩৭৭ সংখ্যা। মাঘ ১৭৯৬ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।
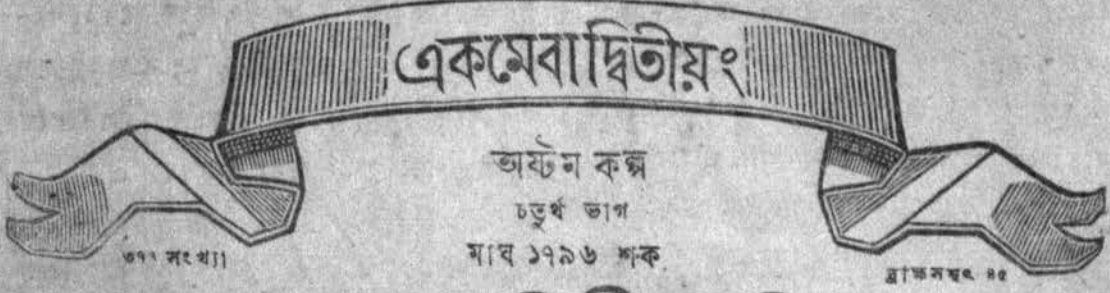
আগামী ১১ মাঘ শনিবার পঞ্চ-চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মস-মাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৬।।ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা ও সঙ্গীত সহকারে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

১১ মাঘ শনিবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

ষষ্ঠ খণ্ড।

ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীযতে ইয়মেব সাঽগ্নিরমস্তৎসাম। ১।

ইদানীং সর্ব্বফলসম্পত্ত্যর্থমুদ্গীথস্যোপাসনান্তরং বিধিৎসতে 'ইয়ং এব' পৃথিবী 'ঋক্' ঋচি পৃথিবীদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা তথা 'অগ্নিঃ সাম' সাম্নি অগ্নিদৃষ্টিঃ। কথং পৃথিব্যগ্ন্যোঃ ঋক্সামত্বমিতি উচ্যতে 'তৎএতৎ'অগ্ন্যাখ্যং 'সাম' 'এতস্যাং' পৃথিব্যাং 'ঋচি' 'অধ্যূঢ়ং' অধিগতং উপরিভাবেন স্থিতমিত্যর্থঃ 'তস্মাৎ' কারণাৎ 'ঋচি অধ্যূঢ়ং সাম' 'গীয়তে' সামগৈঃ। যথা ঋক্সামনী অন্যোন্যং নাত্যন্তভিন্নে তথৈতৌ পৃথিব্যগ্নী। কথং 'ইয়ং এব' পৃথিবী 'সা' সামনামার্দ্ধশব্দবাচ্যা, ইতরার্দ্ধশব্দ-বাচ্যঃ 'অগ্নিঃ' 'অমঃ' 'তৎ' এতৎ পৃথিব্যগ্নিদ্বয়ং সামৈ-কশব্দাভিধেয়ত্বমাপন্নং 'সাম'। ১।

এই পৃথিবীই ঋক্ অগ্নি সাম। সামরূপ অগ্নি এই পৃথিবী রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা পৃথিবী তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম অগ্নি তাহার বাচ্য। ঐ দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ১।

অন্তরিক্ষমেবর্গ্বায়ুঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীযতেঽন্তরিক্ষমেব সা বায়ুরমস্তৎসাম। ২।

'অন্তরিক্ষং এব ঋক্ বায়ুঃ সাম' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।২।

অন্তরিক্ষই ঋক্ বায়ু সাম। সামরূপ বায়ু এই অন্তরিক্ষ রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে। এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা অন্তরিক্ষ তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম বায়ু তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ২।

দ্যৌরেবর্গাদিত্যঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীযতে দ্যৌরেব সাদিত্যোঽমস্তৎসাম। ৩।

'দ্যৌঃএব ঋক্ আদিত্যঃ সাম' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।৩।

আকাশই ঋক্ আদিত্য সাম। সাম রূপ আদিত্য এই আকাশ রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা আকাশ তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম আদিত্য তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৩।

নক্ষত্রাণ্যেবর্ক্ চন্দ্রমাঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীয়তে নক্ষত্রাণ্যেব সা চন্দ্রমাঅমস্তৎসাম। ৪।

'নক্ষত্রাণিএব ঋক্ চন্দ্রমাঃ সাম' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।৪।

নক্ষত্র সকলই ঋক্ চন্দ্রমা সাম। সাম রূপ চন্দ্রমা এই নক্ষত্র রূপ ঋকের উপর অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা নক্ষত্র সকল তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম চন্দ্র তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৪।

অথ যদেতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢং সাম গীয়তে অথ যদেবৈতদাদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সাথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎসাম। ৫।

'অথ' অনন্তরং 'যৎএতৎ আদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ' শুক্লা দীপ্তিঃ 'সা এব ঋক্' 'অথ' পুনঃ 'যৎ আদিত্যে নীলং পরঃ কৃষ্ণং' পরোঽতিশয়েন কৃষ্ণবর্ণং 'তৎ সাম' তদেতদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৫।

অনন্তর আদিত্যে যে শুক্লবর্ণ দীপ্তি তাহাই ঋক্ আর যে নীল অথচ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহাই সাম। নীলবর্ণ দীপ্তিরূপ সাম এই শুক্লবর্ণ দীপ্তি রূপ ঋকের উপর অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপর সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা আদিত্যের শুক্ল বর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম আদিত্যের কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৫।

অথ যএষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশআপ্রণখাৎ সর্ব্বএব সুবর্ণঃ। ৬।

'অথ' অনন্তরং 'যঃ এষঃ অন্তরাদিত্যে' আদিত্যস্যান্তর্ম্মধ্যে 'হিরন্ময়ঃ' সুবর্ণময়ইব 'পুরুষঃ' পুরিশয়নাৎ 'দৃশ্যতে' সমাহিতচেতোভিঃ 'হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ' জ্যোতির্ম্ময়ান্যেবাস্য শ্মশ্রূণি কেশাশ্চেত্যর্থঃ' 'আপ্রণখাৎ' প্রণখোনখাগ্রং নখাগ্রেণ সহ'সর্ব্বঃ এব' 'সুবর্ণঃ' সুবর্ণইব ভারূপ ইত্যর্থঃ। ৬।

অনন্তর, আদিত্যের মধ্যে যে এই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দেখা যায়, তিনি হিরণ্য শ্মশ্রু ও হিরণ্য কেশ, তাঁহার নখাগ্র অবধি সর্ব্ব শরীর সুবর্ণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। ৬।

তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম সএষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত, উদেতি হবৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো যএবং বেদ। ৭।

'তস্য' সর্ব্বতঃ সুবর্ণময়স্য 'যথা' 'কপ্যাসং' কপেঃ মর্কটস্য আসং উপবেশনার্থঃ পৃষ্ঠান্তভাগঃ তমিব 'পুণ্ডরীকং' অত্যন্ততেজস্বি 'এবং' অস্য দেবস্য 'অক্ষিণী'

'তস্য' এবং গুণবিশিষ্টস্য 'উৎইতি নাম' গৌণমিদং কথং গৌণত্বং 'সঃ এষঃ' দেবঃ 'সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ' পাপ্মনা সহ তৎকার্য্যেভ্যঃ 'উদিতঃ' উদ্গতঃ অতো-হসৌ উৎনাম্না। তং 'এবং' গুণসম্পন্নং উন্নামানং যথোক্তেন প্রকারেণ 'যঃ বেদ' সঃ এবমেব 'উদেতি' উদ্গচ্ছতি 'সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ' 'হ বৈ' ইতি অবধারণার্থৌ নিপাতৌ। ৭।

মর্কটের পৃষ্ঠান্ত প্রদেশ যেমন অত্যন্ত তেজস্বী এই দেবতার চক্ষুর্দ্বয় সেই রূপ তেজস্বী এবং উৎ তাঁহার নাম, যে হেতু তিনি সকল পাপ কার্য্য হইতে উদিত অর্থাৎ পৃথক হয়েন, যে ব্যক্তি ইহাঁকে জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে উদিত হয়েন। ৭।

তস্যর্কচ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্গীথ-স্তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা সএষ যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেব-কামানাং চেত্যধিদৈবতং। ৮।

তস্যোদ্গীথত্বমাদিত্যাদীনামিব বিবক্ষিত্বাহ 'তস্য ঋক্‌চ সামচ গেষ্ণৌ' পৃথিব্যাদ্যুক্তলক্ষণে পর্ব্বণী সর্ব্বাত্মা হি দেবঃ 'তস্মাৎ উদ্গীথঃ' 'হি' যস্মাৎ 'এতস্য' যথোক্তস্য উৎনাম্নঃ 'গাতা' অসৌ 'তস্মাৎ তু' যুক্তা 'এব' 'উৎগাতা' ইতি। 'সঃ এষঃ' দেবঃ উৎনামা 'যে চ অমুষ্মাৎ' আদিত্যাৎ 'পরাঞ্চঃ' ঊর্দ্ধাঃ 'লোকাঃ' 'তেষাং' লোকানাং 'ইষ্টে' কিঞ্চ 'দেবকামানাঞ্চ' ইষ্টে 'ইতি অধিদৈবতং' দেবতাবিষয়মুদ্গীথস্বরূপং। ৮।

পূর্ব্বোক্ত ঋক্‌সাম সেই দেবের পর্ব্ব, অতএব তিনি উদ্গীথ, যে হেতু ইহাঁর গানকর্ত্তাই উদ্-গাতা হয়েন, সূর্য্য হইতে ঊর্দ্ধে যে সকল লোক, ইনিই তাঁহারদিগকে নিয়মিত করেন এবং দেব কামিদিগকেও নিয়মিত করেন, ইহাই অধি দৈবত। ৮।

সাংখ্য-দর্শন।

যুক্তি (অনুমান) ও যৌতিক জ্ঞান (অনুমিতি)।

পূর্ব্ব কথিত ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের সহিত এই যৌতিক-জ্ঞানের অত্যন্ত ঘনিষ্টতা। সেই হেতু ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা প্রকরণোক্ত নিয়ম গুলি এখানেও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় পরীক্ষা প্রকরণের এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, "ইন্দ্রিয় কেবল বস্তুর একটা সামান্য আকার মাত্র গ্রহণ করে, তদ্গত বিশেষণ গুলির কল্পনা বা ভাল মন্দ বিবেচনা কিছুই করে না। কারণ, বিবেচনা শক্তি বা কল্পনা শক্তি, মন ভিন্ন অন্য কাহারও নাই।" পূর্ব্ব কথিত বৃত্তান্তের এই অংশ আ-পাততঃ স্থির রাখিতে হইবে; কেন না, এই অংশকে যাবৎ-যৌক্তিক জ্ঞানের বীজ, ভিত্তি, জীবন ইত্যাদি যাহা বল, তাহাই বলা যায়।

অগ্নিকামী পুরুষ দূর হইতে ধূম দর্শন করিয়া, কুসুমার্থী ব্যক্তি গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, অনেক সময়ে অগ্নির নিমিত্ত কুসুমের নি-মিত্ত ধাবিত হয়। কেন হয়?—না যৌ-ক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরূঢ় হইয়া তাহাদিগকে উত্তেজনা করিতে থাকে যে, যাও—ঐদিকে যাও অগ্নি পাইবে, কুসুম

[illegible] হইয়াছেন, অস্ত যাইবেন, পুনর্ব্বার উদয় হইবেন। পুনর্ব্বার উদয় হইলে কল্য হইবে, কল্যের পর পরশ্ব, তৎপরে তৎ-পরশ্ব, ইত্যাদি ক্রমে সংগৃহীত একটি সহস্র সংবৎসরাত্মক কালকে এক নিমেষ মাত্র পরিমিত কালের মধ্যে ধ্যানস্থ করিয়া মনুষ্য শত সহস্র শিল্পী, শত সহস্র দ্রব্য সম্ভার, সহস্র সহস্র প্রাণিবল সাপেক্ষ বৃহত্তম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। কেন হয়? না যৌক্তিক জ্ঞান তাহাদিগের হৃদয়ে আরোহণ করিয়া প্রলো-ভন দেখাইতে থাকে যে, ইহা কর। অধিক কি, প্রাণিগণের যে কিছু কার্য্য-প্রবৃত্তি, সমস্তই যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা। যৌক্তিক জ্ঞান যদ্যপি প্রাণি হৃদয়কে উৎসাহিত না করিত, তাহা হইলে এ জগতের মানবিক (মনুষ্য সাধ্য) উন্নতি কিছুমাত্র হইত না। ব্যবহারের যোগ্য দৃশ্য পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা দুই ব্যক্তি, প্রকৃতি আর পুরুষ। প্রকৃতি,

অহঙ্কারাদি ভূত ভৌতিক বহুল পদার্থে পরিণতা হইতেছে; জীব ভাবাপন্ন পুরুষ, সেই গুলি লইয়া যৌক্তিক জ্ঞান-পূর্ণ মনের সাহায্যে নানাবিধ বাহ্য দৃশ্যের নির্ম্মাণ করত জগতের বিচিত্রতা সম্পাদন করিতে-ছেন (১)। জীব যাহা নির্ম্মাণ করে, তা-হাকে জৈবিক নির্ম্মাণ বলে, এই জৈবিক নির্ম্মাণ দুই প্রকার। প্রথমতঃ অন্তর নির্ম্মাণ, (মনে মনে গঠন) পশ্চাৎ বাহ্য নির্ম্মাণ। একটি বাহ্য দৃশ্য নির্ম্মাণ করিতে হইলে যতকাল, যত দ্রব্য, যত লোক-বল অপেক্ষা করে, আবার সেই দৃশ্যটির অন্তর নির্ম্মাণ কালে ততকাল, তত দ্রব্য, তত লোক-বল, কিছুই অপেক্ষা করে না। জীব, ক্ষণ পরি-মিত কালের মধ্যে, বিনা দ্রব্যে, বিনা সা-হায্যে, এমন এক দৃশ্য নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, যে দৃশ্যটির বহির্নির্ম্মাণ কালে দশ সহস্র শিল্পী, শত সহস্র [illegible] দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘতম কাল লাগিবে। অতএব আন্তর সৃষ্টি ও বাহ্য সৃষ্টির মধ্যে সমধিক প্রভেদ আছে। আমরা পল্লী, গ্রাম, নগর, সেতু, অট্টালিকা প্রভৃতি যে কিছু জীব নির্ম্মিত দৃশ্য পরিপাটী দেখিতে পাই, এ সমস্তই এক সময়ে না এক সময়ে জীবের অন্তরে ছিল। অন্তরে না থাকিলে কদাপি আমরা বাহিরে দেখিতে পাইতাম না। জীব, অগ্রে মনে মনে নির্ম্মাণ করে, পশ্চাৎ বাহিরে নির্ম্মাণ করে। মনে মনে যাহার নির্ম্মাণ করা গেল না, তাহা বাহিরেও নি-র্ম্মিত হইবে না। এই নিয়ম সর্ব্ব কালের নিমিত্ত এবং অব্যভিচারী। এ বিষয়ে অধিক বলা অপ্রাসঙ্গিক বটে, কিন্তু না ব-লিলেও ক্ষান্ত থাকা যায় না। কেন না, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব মনের সম্বন্ধ, এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সহচারিত্ব, যুক্তির স্বভাব এবং যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে আ-পনা আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়(২)।

শ্রদ্ধালু আস্তিক ঈশ্বরবাদী পুরুষেরা বলেন,"কিমীহঃ কিংকায়ঃ সখলু কিমুপায়স্ত্রি-ভুবনং কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদান ইতিচ"? ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু তিনি কি প্রকারে—কি কৌশলে—কিরূপ যত্নে—কোথায় বসিয়া—কি দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন?—যদি এ সকল বুঝিতে আ-রোহণ করাইতে চাও তবে যুক্তি কুশল সংস্কৃতাত্মা পুরুষের আন্তর সৃষ্টির বিষয় একবার চিন্তা কর—বুঝিতে পারিবে। এক সময়ে ইহা ঈশ্বরেরও সংকল্প ছিল(৩)। ফল, সঙ্কল্পাত্মক যৌক্তিক জ্ঞানের মহিমা, শক্তি, পরিমাণ, কিছুরই ইয়ত্তা করা যায় না।

এতাদৃশ মহিমান্বিত যৌক্তিক জ্ঞানের পরিচয় থাকা কোন্ পুরুষের না অভিলষ-নীয়?—সকল পুরুষেরই অভিলষনীয়। কিন্তু সে পক্ষে এক বলবৎ প্রতিবন্ধক আছে। প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞান, আর কতকগুলি যুক্ত্যাভাস ও যৌক্তিকাভাস (অর্থাৎ প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক জ্ঞা-নের বেশধারী কতকগুলি ভণ্ড জ্ঞান) সর্ব্ব-দাই একত্র বাস করে। তন্মধ্য হইতে প্রকৃত যুক্তি ও প্রকৃত যৌক্তিক-জ্ঞানকে চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। প্রকৃত যুক্তি কিরূপ?—চিনিতে না পারিলে, একটা যুক্ত্যাভাস মাত্র

(১) "ঈশ্বরেণাপি জীবেন স্রষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে"। (দ্বৈত বিবেক)

সাংখ্য মতে প্রকৃতিই মূল পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্রী, পুরুষ অকর্ত্তা হইলেও মন যুক্ত হওয়াতে তাঁহার বাহ্য নির্ম্মাণে কর্তৃত্ব আছে।

(২) "মনসাহর্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্ম্মণা।"—"সংখ্যাতুং নৈব শক্যানি কর্ম্মাণি পুরুষর্ষভ। আগারনগরাণাং হি সিদ্ধিঃ পুরুষহেতুকী।" (বনপর্ব্ব)

(৩) "স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—(শ্রুতি)

অবলম্বন করিয়া তজ্জনিত জ্ঞানের অনুগামী হইলে মনুষ্যকে পদে পদে প্রতারিত হইতে হয়। অতএব যে উপায়ে হউক, প্রথমত যথার্থ যুক্তিকে চেনা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চিনিবার উপায় কি? যুক্তি বা যৌক্তিক জ্ঞান একটি নহে, তাহা অসংখ্য। অসংখ্য যৌক্তিক জ্ঞানের এক একটি করিয়া চিনিতে হইলে, সমস্ত জীবন ব্যয় করিলেও শেষ হইবে না, সুতরাং সে পক্ষে হতাশ্বাস হওয়াই ভাল। যদ্যপি প্রকৃত যুক্তির কোন প্রকার বিশেষ লক্ষণ থাকে, তাহা হইলে আর হতাশ্বাস হইতে হয় না। কেন না, সেই লক্ষণ যাহাতে দেখিতে পাইব, তাহাকেই প্রকৃত যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিব, অন্যকে পরিত্যাগ করিব। একটির লক্ষণ অবগত থাকিলে তদ্দ্বারা তজ্জাতীয় সমস্ত পদার্থের অবগতি লাভ করা যাইতে পারে (৪)।

যুক্তি-নিপুণ দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, কোন বিষয়ে মনুষ্যের হতাশ্বাস হওয়া উচিত নহে। সকল বিষয়েরই যখন একটা না একটা লক্ষণ আছে, তখন যুক্তি বা যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ না থাকিবে কেন? অবশ্য আছে। প্রকৃত যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ আপাততঃ এই রূপ স্থির কর,—

এই জগতে পৃথক্ পৃথক্, বা একত্রিত, অথবা পূর্ব্বাপরীভাবে (কার্য্য কারণ ভাবে) অবস্থান করে, ঈদৃশ পদার্থ বহুল পরিমাণে আছে। তন্মধ্যে যাহার সহিত যাহার অবিনাভাব সম্বন্ধ (পরস্পর অবিযুক্ত ভাবে, বা অপৃথক্ ভাবে থাকা) আছে, তাহার একটির উপলব্ধি হইলে, অন্যটির সহিত তাহার যেরূপ স্বাভাবিক অবিনাভাব সম্বন্ধ নির্ণীত আছে, মনো মধ্যে সেই সম্বন্ধের উপস্থিত হওয়া ও তদ্বিষয়ে মনের পরীক্ষাত্মক ব্যাপার উপস্থিত হওয়ার নাম যুক্তি; আর সেই যুক্তি-জন্য জ্ঞানের নাম যৌক্তিক জ্ঞান।

এই লক্ষণটি কাপিল সূত্রের অনুসারী (৫)। সূত্রকার মাত্রেই সংক্ষেপ বক্তা। সূত্র দ্বারা নানাবিধ অর্থ ও রীতি পদ্ধতির সূচনা মাত্র করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। স্পষ্ট করিয়া বলা কেবল আচার্য্যদিগের রীতি, সূত্রকারদিগের নহে। সূত্রকারেরা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, যে পথে, যে রীতিতে, যে অর্থের উদ্দেশে চলিতে হইবে,—বক্তব্য বিষয়ের শরীর যে রূপে চিত্রিত করিলে স্পষ্ট হইবে, সে সমস্তই সূত্র মধ্যে নিহিত করিয়া রাখেন। পশ্চাবর্ত্তী আচার্য্যেরা সেই সেই অংশ অবলম্বন করিয়া বিস্তার করিয়া থাকেন। উপরোক্ত যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের লক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা সূত্রানুসারী বলিয়া স্পষ্ট হয় নাই, নির্দ্দোষও হয় নাই। এজন্য পুনশ্চ উহাকে আচার্য্যদিগের রীতিতে বলা আবশ্যক, কিন্তু আচার্য্য-রীতিতে বলিতে গেলে এই প্রস্তাব এত বিস্তীর্ণ হইবে যে, ঈদৃশ সহস্র পত্রিকায়ও পর্য্যাপ্ত হয় কি না সন্দেহ। সুতরাং অবিকল আচার্য্য রীতির অনুসরণ না করিয়া তন্মধ্য হইতে অবশ্য বক্তব্য স্থূল স্থূল অংশ গুলিকেই বিবৃত করা যাইতেছে।

কোন পদার্থ কোন এক পদার্থের সহিত নিয়ত অবস্থান করে,—কোন এক বস্তুর অভাব হইলে, তৎসঙ্গে অন্য এক বস্তুর অভাব হয়,—কোন এক পদার্থ উৎপন্ন হইলে, তৎসঙ্গে বা তাহার অব্যবহিত পরে

(৪) "দ্বয়োরপি পদার্থানাং নান্তং যান্তি পৃথক্ত্বশঃ। লক্ষণেন তু সিদ্ধানামন্তং যান্তি বিপশ্চিতঃ"। (সায়ণাচার্য্য)

(৫) "প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্"। (কপিল সূত্র)

অন্য এক পদার্থ জন্ম গ্রহণ করে ইত্যাদি প্রকার এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকার নিয়ম দৃষ্ট হয়, সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধের নাম অবিনাভাব সম্বন্ধ, আর একটি নাম ব্যাপ্তি।

জগতে, পদার্থে পদার্থে যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি বিদ্যমান আছে, এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি থাকাই যুক্তির পূর্ব্ব রূপ, আর মনুষ্য মনে তাহার অভ্রান্ত সংস্কার জন্মানই উত্তর রূপ। উভয় রূপ একত্রিত হইলে যুক্তি জীবন লাভ করিতে পারে। বহ্নির সহিত ধূমের(৬), চলন ক্রিয়ার সহিত বেগের এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে। দেখিয়া দেখিয়া যদ্যপি কোন মনুষ্যের সংস্কার জন্মে যে, ধূম থাকিলে নিশ্চয় অগ্নি থাকে, আর বেগ উপস্থিত করিলে চলন অবশ্য হইবে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের নিকট যুক্তি স্বীয় শরীর বিস্তার করিবে এবং তাহার হৃদয়ে উপবেশন করিবে।

কোথাও ব্যাপ্তি দর্শন করিলে তাহা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক পরীক্ষা করিতে হয়। যদি পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় হয় যে, সে ব্যাপ্তি স্বাভাবিক নহে, কোন পদার্থান্তরের সংসর্গাধীন ঘটিয়াছে; তাহা হইলে সেই ব্যাপ্তিকে অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া পরিহার কর। যদি পরীক্ষা প্রয়োগ করিলেও তাহাতে পদার্থান্তরের সংযোগ লক্ষ্য না হয়, তবে তাহাকে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি বলিয়া গ্রহণ কর।

মনে কর, কোথাও ধূম ও বহ্নির সামানাধিকরণ্য (এক স্থানে অবস্থান) দৃষ্ট হইল। হইলে, প্রথমতঃ ইহাই দেখা আবশ্যক যে, ধূম ও বহ্নি, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টির সহিত কোন্‌টির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে; বহ্নির সহিত ধূমের? কি ধূমের সহিত বহ্নির?

---

(৬) অনেকের জ্ঞান আছে যে, বাষ্প ও ধূম একই বস্তু। এই জ্ঞান থাকাতেই তাঁহারা অনেক সময়ে অনেক বিভ্রাট্ ঘটাইয়া থাকেন। ফল, ধূম ও বাষ্প অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ। বাষ্পে অন্য পদার্থের লেশ মাত্রও নাই। বাষ্প কেবল কতকগুলি জলীয় পরমাণু মাত্র। কিন্তু ধূমে জলীয় পরমাণুও আছে, পার্থিব পরমাণুও আছে। ধূমের পার্থিবাংশ ধরা পড়ে কজ্জলে। একটি তৈজস পাত্রের গাত্রে স্নেহ দ্রব্য ভ্রক্ষণ করিয়া ধূমোদ্‌গম স্থানে ধরিলে ধূমের সমস্ত পার্থিবাংশ ঐ পাত্রের গাত্রে আবদ্ধ হইবে। যদি কেহ বিশুদ্ধ পৃথিবী ধাতুর রূপ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি কজ্জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কেন না, পৃথিবীর স্বাভাবিক রূপ ঐরূপ কাল। জলের স্বাভাবিক রূপ ভাস্বর শুক্ল। ইহা পরীক্ষিত হইয়া "যৎ কৃষ্ণং তৎ পৃথিবী, যৎ শুক্লং তদপাং"—ইত্যাদি বৈদিক বাক্যে গ্রথিত হইয়াছে। পৃথিবী ধাতু কৃষ্ণবর্ণ ও জল ধাতু শুক্লবর্ণ। ধূমে পার্থিবাংশ আছে, জলাংশও আছে। বাষ্পে কেবল মাত্র জল আছে; (বায়ুর অংশ থাকিলেও তাহা এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে, কেন না বায়বীয় পরমাণু দ্বারা কখন কঠিন স্পর্শ জন্মে না এবং সে নিজেও ঘনীভূত হয় না) এ বিষয়ে ধূম অপেক্ষা বাষ্প শুভ্রবর্ণ (ফ্যাঙাশে বর্ণ) আর বাষ্প অপেক্ষা ধূম কিছু কৃষ্ণবর্ণ। ধূমে পার্থিবাংশ আছে বলিয়া যে বস্তুতে ব্যাপক কাল ধূম স্পর্শ হয়, সে বস্তু মলিন হয়, কিন্তু সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যদি বাষ্প স্পর্শ হয়, তাহা হইলে সে কদাচ মলিন হইবে না, প্রত্যুত বাষ্প, স্বীয় জলাংশ দ্বারা সেই বস্তুকে আর্দ্র করিয়া রাখিবে। অপিচ, বাষ্প ও ধূম এক কারণোৎপন্ন নহে। ধূমের কারণ আর্দ্র-ইন্ধন সংযুক্ত বহ্নি; আর বাষ্পের কারণ সাধারণ উষ্মতা। উষ্মতা ব্যতিরেকে বাষ্প জন্মিতে পারে না। উষ্মতা, গভীর-জল জলাশয়ের মধ্যেও বাস করে। শীত কালে যে জলাশয় হইতে বাষ্প উত্থিত হয়, সেই বাষ্পেরও কারণ উষ্মতা। শীত কালে জলের মধ্যে উষ্মতা থাকে কি না, তাহা তিনিই অনুধাবন করিতে পারিবেন, যিনি শীত কালের অতি প্রত্যূষে নদী বা পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়াছেন।

বাষ্প ও ধূমের প্রায় একাকারতা আছে বলিয়া, কখন কখন বাষ্পেতে ধূমের ভ্রম জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু ধূম ও বাষ্প এক পদার্থ কোন মতেই হইতে পারে না। বাষ্পেতে ধূম ভ্রম হইলে, সেই ভ্রম গৃহীত ধূমের দ্বারা বহ্নির সত্তা নিশ্চয় হইবে না কিন্তু তৎ প্রদেশে সাধারণ উষ্মতার সত্তা নিশ্চয় হইবে। এই সকল কথা ন্যায়-গ্রন্থে ও বৈদান্তিকদিগের গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

যদি বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকা নির্ণয় হয়, তাহা হইলে ধূমের সত্তায় বহ্নির সত্তা নিশ্চয় হইবে। আর যদি ধূমের সহিত বহ্নির অবিনাভাব থাকাই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে বহ্নির সত্তায় ধূমের সত্তা নির্ণয় করিতে হইবে। অতএব কোন্‌টির সহিত কোন্‌টির অবিনাভাব স্বাভাবিক, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত পরীক্ষা প্রয়োগ করা আবশ্যক। সে পরীক্ষা অন্য প্রকার নহে, কেবল দাহ্য পদার্থের প্রক্ষেপ নিক্ষেপ করা (অর্থাৎ একটি দাহ্য ত্যাগ করিয়া অন্য আর একটি দাহ্যের সংযোগ করা)। এবম্প্রকার পরীক্ষা দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইবে যে, বহ্নির সহিত জলীয় পরমাণু বহুল দাহ্য পদার্থের সংযোগেই ধূম জন্মায়, তৈজস পদার্থের সহযোগে জন্মায় না। কেন না, বহ্নি মধ্যে এক খণ্ড কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিলে, তাহার দাহন কালেই ধূম জন্মে, কিন্তু এক খণ্ড সুবর্ণ নিক্ষেপ করিলে, সেই সুবর্ণ খণ্ডকে দাহ করিবার সময় ধূম জন্মায় না। অতএব ধূম ও বহ্নির স্বাভাবিক ব্যাপ্তি জিজ্ঞাসুর ইহাই অবধারণ করা কর্ত্তব্য যে, বহ্নির সহিতই ধূমের স্বাভাবিক ব্যাপ্তি, ধূমের সহিত নহে। ধূমের সহিত বহ্নির যে ব্যাপ্তি দেখা গিয়াছিল, তাহা স্বাভাবিক নহে। তাহা পদার্থান্তরের (দাহ্য বিশেষের) সংযোগ বশতঃ। এই রূপ নির্ণয়ের ফল এই যে, কোথাও অবিছিন্নমূল ধূম মাত্র দেখিতে পাইলে তন্মূলে বহ্নি প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারিবে, কিন্তু বহ্নি মাত্র দেখিয়া কজ্জল সম্পাদনের নিমিত্ত তদুপরি ধূমের আশা করা যাইতে পারিবে না।

যে কারণ দ্বারা ব্যাপ্তির অস্বাভাবিকত্ব প্রতিপন্ন করা যায়, সেই কারণ-দ্রব্যটির নাম উপাধি। (যথা জলীয় পরমাণু বহুল পদার্থের সংযোগ ধূমের সহিত বহ্নির অস্বাভাবিক ব্যাপ্তি প্রতিপাদন করে) এই উপাধি দুই প্রকারে উপস্থিত করা যায়। এক শঙ্কিত রূপে, অপর সমারোপিত রূপে। উপাধির প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহা সমারোপিত উপাধি হইবে, আর উপাধি থাকায় শঙ্কা মাত্র করিলে তাহা শঙ্কিত রূপে পরিণত হইবে। এই দুই প্রকার উপাধিই অনিষ্টকারী, কিন্তু তদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সমারোপিত উপাধি উপস্থিত জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, শঙ্কিত উপাধি তাহা হয় না; তবে কি না সে নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতির ব্যাঘাত জন্মায়। যুক্তি নির্ম্মাণের পর, তন্মধ্যে যদি কোন উপাধি থাকা নিশ্চয় হয়, তবে সে যুক্তিকে পরিত্যাগ কর, আর যদি কেবল মাত্র উপাধি থাকার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তবে সেই আশঙ্কা মাত্রের পরিহার কর; তর্ক প্রয়োগ করিলেই আশঙ্কা পরিহার হইবে।

মনে কর, ধূম থাকিলেই বহ্নি থাকে। এই একটি স্বাভাবিক ব্যাপ্তির স্থল। এতন্মধ্যে যদি কোন প্রকার উপাধি থাকার আশঙ্কা কর, ধূম থাকিলেই যে বহ্নি থাকিবে, এ নিয়ম স্বাভাবিক না হইতেও পারে। তবে যে বহ্নির সহিত ধূমের একাধিকরণ্য দেখিয়াছি, তাহা কোন প্রকার অজ্ঞাত পদার্থের বলে হইলেও হইতে পারে, (সে পদার্থ লুক্কায়িত আছে, আমরা জানিতে পারিতেছি না) তবে, তর্ক প্রয়োগ কর, তর্ক প্রয়োগ করিলে হয়ত উপাধিটি নিষ্কাষিত হইয়া আসিবে, না হয় শঙ্কা দূর হইবে।

তর্ক,—কার্য্য মাত্রেরই অব্যবহিত পূর্ব্বে কারণ সংলগ্ন থাকে। ইহার অন্যথা কস্মিন্ কালেও হয় না, বা হইবে না। এই নিয়মঅনুসারে, ধূম বহ্নির কার্য্য বলিয়া উদ্গত ধূমের মূল দেশে বহ্নিকে অবশ্য থাকিতে হইবে। বহ্নি যদি ধূম-স্থল ত্যাগ করিয়া

অন্যত্র থাকিতে পারে, তবে বহ্নি ভিন্ন (জলাদি) পদার্থ হইতেও জন্মিতে পারে; তাহা যখন জন্মে না, তখন ঐ ধূম-দণ্ডের মূলে বহ্নি অবশ্য আছে।

এই রূপে উক্তবিধ উপাধিদ্বয়কে নিরাকৃত করিতে পারিলে, ব্যাপ্তির স্বাভাবিকত্ব স্থির হইবে।

এ জগতে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি তিন প্রকার ভিন্ন চতুর্থ প্রকার নাই। অন্বয় ব্যাপ্তি, ব্যতিরেক ব্যাপ্তি, ও উভয়াত্মক ব্যাপ্তি (অর্থাৎ অন্বয়ও আছে ব্যতিরেকও আছে)।

অন্বয় ব্যাপ্তি—যে থাকিলে যে অবশ্য থাকে (যথা ধূম থাকিলে তন্মূলে বহ্নি অবশ্য থাকে।)

ব্যতিরেক ব্যাপ্তি—একটির অভাব হইলে তৎসঙ্গে অন্যটির অভাব হয়। (বহ্নির অভাবে ধূমের, কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব হয়।)

উভয়াত্মক ব্যাপ্তি—যে থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না। (যথা, আর্দ্র-দাহ্য সংযুক্ত বহ্নি থাকিলে ধূম থাকে, না থাকিলে থাকে না।)

উক্ত তিন প্রকার স্বাভাবিক ব্যাপ্তি যে যে পদার্থে আছে; সে সকল অবগত হইতে পারিলেই মনুষ্য যুক্তি-কুশল হইতে পারে। ব্যাপ্তি-জ্ঞান সঞ্চার করিবার উপায় আর কিছু না, কেবল ভূরি ভূরি পদার্থের প্রকৃতি, ভাব, গতি, জাতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করা (৭)। যিনি যে পরিমাণে ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে যৌক্তিক জ্ঞানের অধিকারী হইবেন।

ব্যাপ্তি, দুই বা ততোধিক পদার্থ ঘটিত। তাহার মধ্যে একটি পদার্থ ব্যাপ্ত হয়, অপর গুলি ব্যাপক নামে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণের মধ্যে "যাহার সহিত" এই অংশ দ্বারা যাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেই পদার্থকে ব্যাপ্য; আর "যাহার অবিনাভাব" এই অংশের লক্ষ্য যে পদার্থ তাহাকে ব্যাপক বলিয়া জানিতে হইবেক। দার্শনিক ভাষায় ঐ ব্যাপ্যের নামান্তর—হেতু ও লিঙ্গ। আর ব্যাপকের নামান্তর স্থান বিশেষে—সাধ্য ও প্রতিজ্ঞা।

যুক্তির লক্ষণ বলা উপলক্ষে এ পর্য্যন্ত অংশ অংশ করিয়া যে কিছু বলা হইল, তদ্দ্বারা এই রূপ নিষ্কর্ষ হইতে পারে যে, পরীক্ষাশীল বহুদর্শী ব্যক্তি, বস্তুর স্বভাব, প্রকৃতি, জাতি, গুণ ও সম্বন্ধ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে বলিয়া ঐ সমস্ত গুলি তাহার অন্তরে সংস্কার-বদ্ধ হইয়া আছে। এই ব্যক্তি যদি কখন কোন প্রকার পদার্থ অবলোকন করে, (বা, মনে মনে ধ্যান করে) তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বজাত তাবৎ সংস্কার গুলির উদ্বোধ হইবে। সংস্কারের উদ্বোধ হইবামাত্র, "ইহা অমুক বস্তু—ইহার সহিত অমুকের ঈদৃশ সম্বন্ধ" ইত্যাদি পূর্ব্বালোচিত সমস্ত ভাবের স্মরণ হইবে। এই স্মরণের ফল আন্দোলনাত্মক মানসিক ব্যাপারের উৎপত্তি। সেই মানসিক ব্যাপার যে জ্ঞানকে প্রসব করিবে, সেই জ্ঞান অব্যভিচারী অর্থাৎ ঠিক্ হইবে সন্দেহ নাই। ঈদৃশ অব্যভিচারী জ্ঞানের নাম যৌক্তিক জ্ঞান বা অনুমিতি (অনুমিতিকেও কখন কখন অনুমান শব্দে বলা হয়।) আর ঐ আন্দোলনাত্মক মানসিক ব্যাপারের নাম যুক্তি বা অনুমান(৮)।

---

(৭) "কার্য্যকারণভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ। অবিনাভাবনিয়মো দর্শনান্তরদর্শনাৎ"। (মাধবাচার্য্য)

(৮) ধূম ও বহ্নি ঘটিত দৃষ্টান্ত স্থূল বুদ্ধি ব্যক্তিও বুঝিতে সমর্থ, এ বিষয়ে কোন সূক্ষ্ম পদার্থ গ্রহণ না করিয়া, ধূম ও বহ্নিকে লইয়া সকল কথাই বলা হইল। অপিচ, যদি ভুল সংস্কার থাকে, তবে যুক্তি মিথ্যা হইবে। যে বস্তু দেখিয়া যুক্তি স্থির করিতে হইবে, সেই বস্তুর দেখা যদি ঠিক্ দেখা না হয়, তাহা হইলে যুক্তি কোন কার্য্যকারী হইবে না।

এবম্বিধ যৌক্তিক জ্ঞান কখন আপনার অন্তরে স্বতঃ উৎপন্ন হয়, কখন বা পরের অন্তরে বল পূর্ব্বক উৎপন্ন করাইতে হয়। এ জন্য পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা উহাকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। স্বার্থানুমানে কোন গোলযোগ নাই; কারণ, কোন পদার্থ দর্শন করিলে পর, ব্যাপ্তিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের অনায়াসেই তৎসম্বন্ধ বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। তৎকালে তাহাদিগের অন্তরে পূর্ব্ব কথিত যুক্তির আন্দোলন বা তাহার শরীর প্রকাশ কিছুই হয় না। যেমন চক্ষুর সহিত বিষয়ের সংযোগ মাত্রেই জ্ঞান হয়। যৎকালে চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মে, তৎকালে বা তাহার পূর্ব্বে কি কখন এমন জ্ঞান হয় যে, আমি চক্ষু দ্বারা—এই কারণে—এই রূপ করিয়া দেখিতেছি? কখনই না। স্বার্থানুমান উৎপন্ন হইবার কালেও সেই রূপ জ নিবে কিন্তু পরার্থানুমানে ওরূপ নিয়ম নহে। অবোধ ব্যক্তিকে, বা সংশয়িত ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইলে, তাহার চক্ষুর উপর যুক্তির শরীর নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইতে পারিলে, তবে সে বুঝিবে—তবে সে নিঃসন্দিগ্ধ হইবে। এদ্বিষয়ে, পণ্ডিতেরা যুক্তির শরীর নির্ম্মাণের নিমিত্ত পাঁচটি অবয়ব কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি অবয়বের নাম প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন।

প্রতিজ্ঞা—যেটি সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করা। (যথা, সম্মুখস্থ পর্ব্বতে বহ্নি আছে)।

হেতু (৯)—ব্যাপ্য পদার্থটি দেখান। (যে বস্তু সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার সহিত যে বস্তুর স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, সেই বস্তু দেখান। যথা, দেখ—দৃশ্যমান পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে)।

উদাহরণ—ব্যাপ্য পদার্থ থাকিলে যে তথায় ব্যাপক পদার্থও থাকে, এমন একটি স্থল দেখান। (মনে কর, যেমন পাকশালায় ধূম থাকে এবং বহ্নিও থাকে)।

উপনয়—অনুমেয় পদার্থটির সহিত দৃশ্যমান ব্যাপ্য পদার্থের যে স্বাভাবিক ব্যাপ্তি আছে, তাহা নিঃসংশয়িত রূপে অবগত করান। (ধূম থাকিলে বহ্নি থাকার নিয়ম আছে। মনে কর, তুমি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানেই বহ্নি দেখিয়াছ)।

নিগমন—তর্ক দ্বারা সংশয় ছেদ করতঃ পুনশ্চ প্রতিজ্ঞাত পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধি প্রদর্শন। (বহ্নি-ব্যাপ্য ধূম যখন অবিচ্ছিন্ন ভাবে উঠিতে দেখা যাইতেছে, তখন উহার মূল প্রদেশে বহ্নি না থাকিবার বিষয় কি?)।

(৯) হেতুটি নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। হেতুতে কোন প্রকার দোষ থাকিলে তদ্দ্বারা সত্য লাভের আশা করা যাইতে পারে না। এজন্য হেতুটি সদোষ কি নির্দ্দোষ, বিবেচনা করা আবশ্যক। দোষ থাকে পরিত্যাগ কর—না থাকে গ্রহণ কর, এই নিয়ম সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। হেতুর নির্দ্দোষতা প্রমাণ হইলে, ব্যাপ্তিরও স্বাভাবিকত্ব নিশ্চয় হয়। দুষ্ট-হেতুকে শাস্ত্রকারেরা হেত্বাভাস বলিয়া থাকেন। হেত্বাভাসের অর্থ এই যে, হেতুর ন্যায় জ্ঞান হয় মাত্র কিন্তু সেটি বাস্তবিক হেতু নহে। হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার। সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, ও বাধিত। এই সকল দোষ যুক্ত হেতুর বিবরণ সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যাহাকে হেতু বলিয়া অবধারণ করিতে হয়, সাধ্যের সহিত তাঁহার যদি কখন কোথাও ব্যভিচার দর্শন হয়, তবে তাহাকে সব্যভিচার বলিয়া জান। হেতু ও তাহার আশ্রয় এবং তাহার ব্যাপ্তি থাকা যদি পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে অসিদ্ধ। বিরুদ্ধ-প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ থাকিলে বিরুদ্ধ। অভাব নিশ্চায়ক অন্য হেতু থাকিলে সৎপ্রতিপক্ষ। প্রমাণান্তর দ্বারা হেতুর হেতুত্ব অপগত হইলে বাধিত। এসকল বিস্তার করিতে গেলে অতি বাহুল্য হয়, বিশেষত এ সকল বিচারের প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

কোন কোন আচার্য্যের মতে অবয়ব পাঁচটি না হইয়া তিন্‌টিই কার্য্যকারী হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, ও উদাহরণ। আবার কেহ বলেন, তিন্‌টিরও আবশ্যক নাই, ব্যাপ্তি-জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের নিকট প্রতিজ্ঞার উপরে একমাত্র বিশুদ্ধ হেতু প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হয়। এমতে দুইটি মাত্র অবয়ব বলা হইতেছে।

উক্তবিধ অবয়ব দ্বারা নিষ্পন্ন যুক্তিকে ন্যায় বলিয়া ব্যবহার করা হয়। গৌতম ও কণাদ এবম্বিধ ন্যায়কে বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাদের কৃত গ্রন্থের নাম ন্যায়-গ্রন্থ বা ন্যায়-শাস্ত্র হইয়াছে। এই যুক্তির সহিত মনুষ্য মনের যে কি রূপ অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ আছে—যুক্তি মানব-মনের উপর যে কি পরিমাণে প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহা অবধারণ করিয়া বলা যায় না। সন্দিগ্ধ পুরুষের সন্দেহ ভঞ্জন, ভ্রান্ত পুরুষের ভ্রম নিরাকরণ, অবোধ পুরুষের বোধ উৎপাদন করিতে একমাত্র যুক্তিই পটুতম। জগতে যুক্তিরূপ পরীক্ষা বিদ্যমান না থাকিলে কোন প্রকার মানসিক উন্নতি হইত না; এমন কি, এ জগৎ পুত্র-কলত্রাদির সহিত একত্র বাসেরও উপোযোগী হইত না।

পূর্ব্বে যে তিন প্রকার ব্যাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তদনুসারে যুক্তির গতিও তিন প্রকার হয়। এক প্রকারের নাম পূর্ব্ববৎ, অপর প্রকারের নাম শেষবৎ, তদ্ভিন্ন প্রকারের নাম সামান্যতো দৃষ্ট।

পূর্ব্ববৎ—"কার্য্য থাকিলে তাহার কারণও থাকে" এবম্প্রকার অন্বয় ঘটিত ব্যাপ্তি হইতে যে যুক্তির উত্থান হয়, তাহার নাম পূর্ব্ববৎ। (যথা, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুসন্ধান। এই জাতীয় যুক্তির সাহায্যে মনুষ্য, জগতের শিশু ভাব, ঈশ্বরের বাস গৃহ, স্বর্গের বৈভব নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হয়)।

শেষবৎ—"কারণের অভাব কালে কার্য্যেরও অভাব থাকে" এবম্বিধ ব্যতিরেক ব্যাপ্তি ঘটিত যুক্তির নাম শেষবৎ। (কারণের ভাবাভাব-অনুসারে কার্য্যের ভাবাভাব নির্ণয় করা। এই জাতীয় অনুমান বলে মনুষ্য মৃত্যুর উত্তর কাল ও ভবিষ্যতের গর্ভ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়)।

সামান্যতো দৃষ্ট—এক জাতীয় বহু বস্তুর একটি মাত্র দেখিয়া, তৎ সজাতীয় অদৃশ্য বস্তুর নির্ণয় করা। (এই জাতীয় অনুমানের বলে যাবৎ অতীন্দ্রিয় পদার্থের নির্ণয় হয়) (১০)।

এই তিন প্রকার যুক্তির অনির্ণেয় বস্তু জগতে নাই। এই তিন প্রকার যুক্তির আশ্রয় না লইতে হয়, এমন অবস্থা নাই, সময় নাই, ঘটনাও নাই। যুক্তি, প্রত্যক্ষের উপর প্রভুত্ব করে, বাক্যের উপর প্রভুত্ব করে, যুক্তি ও বাক্য এতদুভয়ের অতীত বিষয়ের উপরও প্রভুত্ব করে। কোন পদার্থ দেখিলে, তাহা ঠিক্ দেখা হইল কি না, যুক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে নির্ণয় হয় না। কেহ কোন উপদেশ বাক্য বলিলে, তাহা সত্য কি না, যুক্তি ব্যতিরেকে বুঝা যায় না। অতএব, ঈদৃশ মহিমান্বিত যুক্তির সহিত সম্পূর্ণ পরিচয় রাখা আবশ্যক এবং ইহাকে বলিতে হইলে বিস্তার করিয়া বলা উচিত। যুক্তি-শূর আচার্য্যেরা যুক্তির প্রতি যে প্রকার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায় উদ্ঘাটন করা অসাধ্য, সুতরাং ইহার প্রকৃত রূপের একটি রেখা মাত্র কল্পনা করিয়া, অপূর্ণ অবস্থায়, শেষ করিতে হইল।

—

(১০) "সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ" (সাংখ্যকারিকা)।

ব্রহ্ম-সাধন।

৩৭২ সংখ্যক পত্রিকার ৮২ পৃষ্ঠার পর।

ব্রহ্ম-সাধন রূপ বিশাল বিষয়টি যে প্রধানতঃ স্বার্থ, প্রীতি ও যোগ প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা এই প্রস্তাবের প্রথমাংশে বিবৃত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল লোকেই স্বস্ব জ্ঞান স্ফূর্ত্তি অনুসারে পরব্রহ্মের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন কিন্তু কেহ তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার দ্বারা স্বীয় সুখ সাধন ও বিপদুদ্ধারের অভিসন্ধি পূর্ণ করাইয়া লইবার জন্যই ব্যস্ত, কেহ বা তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যগ্র এবং কেহ বা তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত জ্ঞান ও সর্ব্বাঙ্গীন যোগ নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসে নিত্য অবস্থিতি করিবার জন্যই ব্যাকুল। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহা একবার প্রশান্ত ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইতেছে। যদি মানবাত্মার সার তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ বিভাগ অপেক্ষা প্রীতি বিভাগ এবং প্রীতি বিভাগ অপেক্ষা যোগ বিভাগ শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

যাঁহারা স্বার্থ বিভাগের অধিবাসী, তাঁহারা ব্রহ্মকে যার পর নাই স্থূল বা সঙ্কীর্ণ রূপে উপলব্ধি করেন এবং তাঁহারা তাঁহার দ্বারা যে সকল অভিলাষ পূর্ণ করাইয়া লইবার নিমিত্ত ব্যগ্র, তাহাও অতীব নীচ, ক্ষণ ভঙ্গুর ও নশ্বর। তাঁহাদিগের মনের যাহা উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা তাহা এই সংসারের ক্ষণস্থায়ী ও কণ্টকাকীর্ণ সুখ সম্পদ ব্যতীত আর কোন বিষয়ের প্রতিই ধাবিত হয় না। ফলতঃ তাঁহাদিগের কি ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, কি আকাঙ্ক্ষা, কি অনুষ্ঠান কলাপ সকলই সঙ্কীর্ণ। পার্থিব সুখ দুঃখের গণনাই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব। তাঁহারা অল্প সুখেই হৃষ্ট এবং অল্প দুঃখেই বিচেতন হয়েন। এক কথায় বলিতে হইলে তাঁহাদিগকে সাংসারিক সুখ দুঃখের ক্রীড়া পদার্থ বলিলেই উপযুক্ত হয়।

যাঁহারা প্রীতি বিভাগে বিচরণ করেন, অর্থাৎ যাঁহারা অন্তরে বাহিরে ব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি করেন এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, মনের আকাঙ্ক্ষা ও অনুষ্ঠান সকল, প্রথম শ্রেণীস্থ লোকদিগের অপেক্ষা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর। ব্রহ্ম প্রীতির পরিণামাবস্থাই যোগের আকর স্বরূপ, ব্রহ্ম প্রীতি স্থায়িত্ব লাভ করিলেই তাহা হইতে যোগের অঙ্কুর পরিস্ফুট হয়।

যাঁহারা যোগ বিভাগের অধিবাসী, তাঁহাদিগের ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান, মনের আকাঙ্ক্ষা এবং বাহ্য ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য সমুদায় বিভাগস্থ লোকের জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যবহারের সহিত তাঁহাদিগের জ্ঞান প্রভৃতির প্রায় ঐক্য দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা কি আত্মা, কি বাহ্য জগৎ সমুদায়কে এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের ইচ্ছা ও শক্তির প্রকাশ জানিয়া নিরন্তর জ্ঞান পূর্ব্বক তাঁহাতেই বিলীন থাকেন। তাঁহাদিগের ঐরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক অবস্থান সামান্যতঃ ব্রহ্ম-সহবাস শব্দে উক্ত হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদিগের সেই সহবাস সাংসারিক লোকদিগের আচার্য্য-সহবাস, বন্ধু-সহবাস, এমন কি নিজ নিজ শরীর-সহবাসের ন্যায়ও নহে। শেষোক্ত সহবাস সকলের নিমিত্ত দুই দুইটি পৃথক্ বস্তু আবশ্যক কিন্তু যাঁহাদিগের বিষয় উক্ত হইতেছে, তাঁহাদিগের

ব্রহ্ম-সহবাসের নিমিত্ত কখনই একাধিক বস্তুর প্রয়োজন হয় না। আত্মার সহিত তদীয় ইচ্ছা ও শক্তির সহবাস যেরূপ, ব্রহ্মের সহিত তাঁহাদিগের সহবাসও ঠিক্ তদ্রূপ। তাঁহাদিগের ঐরূপ একাত্মভাবের সহবাসই সাংকেতিক ভাষায় ব্রহ্মযোগ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। যোগ বিভাগের সাধকগণ এই রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মেতে অবস্থিতি করিয়া প্রশান্ত ও নির্ভয় চিত্তে কাল যাপন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিভাগস্থ সাধকগণ যে রূপ কতক গুলি মনোজ্ঞ স্বরূপ লক্ষণ রচনা পূর্ব্বক তাহা ব্রহ্মেতে আরোপ করিয়া তদনুসারে তাঁহার উপাসনাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, এই বিভাগের সাধকগণ সে রূপ কিছুই করেন না। ইহাঁরা তাঁহাতে কোন প্রকার মনঃকল্পিত স্বরূপ লক্ষণ আরোপ করিতে যার পর নাই কুণ্ঠিত হয়েন। ব্রহ্ম বিষয়ে ইহাঁরা এই মাত্র জানিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন যে, তিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের অদ্বিতীয় নিদান অর্থাৎ তিনি কেবল মাত্র ওঁকারের প্রতিপাদ্য। এই রূপ সংক্ষিপ্ত অথচ মহা বিস্তীর্ণ স্বরূপ জ্ঞান অনুসারেই ইহাঁরা ব্রহ্মের ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত থাকেন। ব্রহ্মধ্যানে সমর্থ হইবার নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিভাগস্থ সাধকগণের যেরূপ নানাবিধ উদ্বোধন নিতান্ত আবশ্যক, তাঁহাদিগের সে রূপ কোন উদ্বোধনের আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদিগের যদি কখন উদ্বোধনের প্রয়োজন হয়, তবে তাহার কার্য্য শুদ্ধ মাত্র আত্ম-দৃষ্টি দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের জীবনের একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা এবং একটি মাত্র লক্ষ্য দৃষ্ট হয়। অনুক্ষণ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মের সহবাসে অবস্থান করাই তাঁহাদিগের এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা ও এক মাত্র লক্ষ্য। সাংসারিক লোকদিগের মনের যে সকল ভাব হর্ষ ও বিষাদ শব্দে অভিহিত হয়, তাহা যোগের অবস্থায় তাঁহাদিগের ত্রিসীমায়ও যাইতে পারে না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাঁহারা প্রায় অনভিজ্ঞ। তাঁহাদিগের জ্ঞান যেমন পবিত্র, আকাঙ্ক্ষা যেমন উচ্চ, তাঁহাদিগের ব্যবহারও সেই রূপ উদার।

যদিও ব্রহ্ম সাধনের স্বার্থ বিভাগ অপেক্ষা প্রীতি বিভাগ এবং প্রীতি বিভাগ অপেক্ষা যোগ বিভাগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তথাচ প্রথম দুইটিকে কেহই উপেক্ষা করিতে পারেন না। যে তিনটি বিভাগের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা ব্রহ্ম সাধনের তিনটি প্রধান সোপান স্বরূপ। যেমন কোন প্রাসাদের সর্ব্বোপরিস্থ সোপানে উত্থিত হইতে গেলে কেহই নিম্নস্থিত সোপান গুলি উপেক্ষা করিতে পারেন না, সেই রূপ উক্ত সোপানত্রয়ের মধ্যে যোগ সোপানটি উচ্চতম হইলেও কেহই অপর দুইটিকে অপ্রয়োজনীয় বা উপেক্ষণীয় মনে করিতে পারেন না। স্থূল পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবেশ করা, নিম্ন পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই উচ্চ স্থানে উত্থান করা এবং বালত্ব পরিত্যাগ করিয়া একেবারেই প্রবীণত্ব লাভ করা নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং সাধনের যে বিভাগেই যিনি থাকুন না কেন, কেহই অনাদৃত হইবার যোগ্য নহেন। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত আর সকলই নিম্ন বিভাগস্থ সাধকদিগের প্রতি সাধ্যানুসারে ঘৃণা প্রকাশ করিতে ক্রটি করেন না কিন্তু অস্মদ্দেশীয় উদার ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাব সে রূপ হওয়া দূরে থাকুক, সকল বিভাগের উপযোগী উপদেশ সকল প্রদান করাই তাহার মুখ্য সংকল্প। এই রূপ মহৎ সংকল্প তাহার সর্ব্বাঙ্গেই দৃষ্ট হয় বলিয়া তাহা যে অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র অ-

পেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না।

এক্ষণে ব্রহ্ম-সাধনের নিম্নতম সোপান হইতে উচ্চতম সোপানে উত্থিত হইবার উপায় কি, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। ব্রহ্ম-সাধনের যোগ বিভাগ আমাদিগের মধ্যে সকলেরই নিতান্ত স্পৃহণীয়; কিন্তু সহিষ্ণুতা সহকারে কতকগুলি নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে কার্য্য না করিলে শত বৎসরেও কেহ তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে পারেন না। কি নিয়মে কার্য্য করিতে থাকিলে যে পরিশেষে তাহা আমাদিগের অধিকার গত হইতে পারে, তাহা আমরা চিন্তা দ্বারা নিশ্চিত রূপে স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণ উক্ত মহান্ লক্ষ্য সাধনাকাঙ্ক্ষায় সহস্রবিধ কঠোর অনুষ্ঠান করিবার পর যে সকল নিয়ম পরবর্ত্তী সাধকদিগের নিমিত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ের অধিকাংশই আমাদিগের বুদ্ধির অনুমোদনীয় বটে, কিন্তু আধুনিক কালের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। তাঁহারা যে কালের লোক, সে কালে সাধারণের কি শারীরিক স্বাস্থ্য, কি মনের শান্তি, কি সাংসারিক অবস্থা, কি সামাজিক শৃঙ্খলা সকল বিষয়ই উপযুক্ত ছিল; সুতরাং তাৎকালিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে আমাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে যে সকল মহাপুরুষ বিবিধ রূপ কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা ব্রহ্ম-সাধনের যোগ বিভাগে উত্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা এপর্য্যন্ত সাধারণের উপকারার্থে কোন প্রকার সাধন-প্রণালী প্রকাশিত করেন নাই; সুতরাং আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতেও কোন প্রকার বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিতেছি না। অতএব আমাদিগকে বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত করিয়া কতক গুলি নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করিতে করিতে সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইতেছে। আমাদিগের এক্ষণকার নির্দ্ধারিত নিয়মাবলির মধ্যে যদি কোনটি লক্ষ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জনক হয়, তবে তাহা আমরা কার্য্য করিবার সময়ে ইচ্ছাক্রমে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারিব। আমরা যে কল্পনা দ্বারাই যোগ সাধনোপযোগী নিয়ম সকল নির্দ্ধারিত করিতে অভিলাষ করিতেছি, এরূপ কেহ মনে করিবেন না। পূর্ব্ব কালীন যোগাচার্য্যদিগের উপদেশ, বর্ত্তমান কালের উন্নততম সাধকদিগের ব্যবহার এবং দেশ কালের অবস্থা সমালোচন করিয়া যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়, আমরা তৎসমুদায়ই লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষ করিয়াছি।

তিনটি প্রধান সহায় ব্যতিরেকে যোগ সাধন রূপ অমৃত ফল কোন মতেই লাভ করা যাইতে পারে না, যথা—জ্ঞান, স্বাধীনতা ও অধ্যবসায়। যাঁহারা এই তিনটি সম্বল বিরহিত হইয়া উক্ত ফল লাভাকাঙ্ক্ষায় জীবন পথে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহারা প্রতি পদে নানা রূপ মরীচিকা দ্বারা প্রতারিত হইয়া অবসন্ন হয়েন। ব্রহ্ম-যোগ সাধনে সমর্থ হইবার নিমিত্ত যেরূপ জ্ঞান, স্বাধীনতা ও অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাদিগের লক্ষণ কি এবং লাভের উপায়ই বা কি তাহাই নির্দ্দেশ করা এক্ষণকার কর্ত্তব্য হইতেছে।

চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিলে মানব জ্ঞানের অনেক প্রকার স্ফূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। কাহার জ্ঞান শাস্ত্রালোচনায়, কাহার জ্ঞান সাংসারিক কার্য্যে, কাহার জ্ঞান বাণিজ্য শিল্প বা কৃষি ব্যবসায়ে এবং কাহার জ্ঞান সামরিক কার্য্যে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। যে কয়েকটির উল্লেখ করিলাম, শুদ্ধ সে

কয়েকটি বিষয়েই নহে, যিনি যেরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া কালযাপন করিতেছেন, তাঁহার জ্ঞান তৎসম্বন্ধীয় বিষয়েই ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। এবম্বিধ যত প্রকার জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি লোক-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই পরম্পরা সম্বন্ধে যোগ সাধনের উপযোগী বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার কিছুই তাহার নিমিত্ত কার্য্যকারী নহে। ব্রহ্ম-জ্ঞানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কার্য্যকারী। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সর্ব্বত্র আবির্ভাব ও তাঁহার সর্ব্ব মূলাধারত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে আমরা ব্রহ্ম-যোগে যোগী হইতে পারি না। যত এই জ্ঞান উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইবে, ততই উক্ত যোগের সহায় হইবে।

স্বাধীনতা শব্দ বলিবা মাত্র লোকের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, এস্থলে সে রূপ ভাব আমাদিগের লক্ষ্য নহে। রাজ-শাসনের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করাই যে স্বাধীনতা, ইহাই অনেক ব্যক্তির মনে আপাতত উদিত হয়, কিন্তু সে রূপ স্বাধীনতা সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছুই বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে; কারণ তাহা যোগ সাধনের পক্ষে অনুকূলও নহে, নিতান্ত প্রতিকূলও নহে। স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, না, নিজের অধীনতা। এই রূপ অর্থযুক্ত স্বাধীনতাই আমাদিগের এস্থলে বক্তব্য। আত্মা যখন সর্ব্ব প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থিতি করে, তখনই তাহা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হয়। আমাদিগের ন্যায় সাধারণ লোকের আত্মা যেমন দুঃখের বন্ধনে বন্দী, তেমনি আবার সুখের সম্বন্ধেও বন্দী। যদি সুখ দুঃখের বন্ধনে আত্মা কখনই আবদ্ধ না হয়, তাহা হইলেই সে যথার্থ স্বাধীন। আত্মা স্বভাবতঃ যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তি বৃন্দের অধীনতা, শরীরের অধীনতা, পরিবারের অধীনতা, সমাজের অধীনতা, রাজার অধীনতা এবং অলক্ষিত পূর্ব্ব দৈব ঘটনার অধীনতা বশতঃ সততই তজ্জনিত নানা প্রকার সুখ দুঃখ দ্বারা আন্দোলিত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। তাহার এই রূপ ভয়ানক অধীনতা সত্ত্বে সে কোন ক্রমেই ব্রহ্মের সহিত দৃঢ় রূপে যোগ নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। আত্মা যে পরিমাণে প্রোক্ত পরাধীনতা রাশি হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হয়, যোগ সাধন বিষয়েও তাহার সেই পরিমাণে সফলতা জন্মে। যদি কেহ মনে করেন যে তিনি (তাঁহার আত্মা) ঐ সমুদায়ের অধীন থাকিয়াও ব্রহ্মের সহিত স্থায়ি যোগ স্থাপন করিতে পারিবেন, তবে তাঁহাকে ইহাই বলা উচিত যে তিনি স্বপ্নে সাহসিকতা প্রকাশ করিতেছেন অথবা শূন্যে দাঁড়াইয়া পর্ব্বত উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যেরূপ অধ্যবসায় সহায় থাকিলে যোগ সাধনে কৃতার্থ হওয়া যায়, তাহা সামান্য অধ্যবসায় নহে। অবিরাম চেষ্টার নাম অধ্যবসায়। লোকে যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে সাধারণ কার্য্য কলাপ সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা ব্রহ্মযোগ সাধন রূপ উৎকৃষ্টতম কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না; কারণ বিশেষ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই সে রূপ অধ্যবসায় মন্দবেগ বা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার অন্তর্নিহিত জীবন-স্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা করেন, সেই রূপ অধ্যবসায়ই আমাদিগের প্রস্তাবিত সাধনের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল। কারণ সে অধ্যবসায় কি দুঃখ কি বিপদ, কি আসন্ন মৃত্যু কিছুতেই প্রতিরোধিত হয় না। উহা বাধা পাইলে নিবৃত্ত না হইয়া বরং সমুত্তেজিত হয়।

অতঃপর যে সকল উপায় দ্বারা উক্ত

ত্রিবিধ সাধন-সহায়ের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে, তাহা বিবৃত হইতেছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

অত্রি সংহিতা * ।

গো-গৃহে, কন্দুশালায় এবং তৈল-চক্র ও ইক্ষু-যন্ত্রে আর স্ত্রী ও রোগী বিষয়ে শুচিত্ব বা অশুচিত্ব বিচার করিবেক না। কোন কর্ম্মেই স্ত্রীলোক দূষ্য হয় না, বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম্মেও ব্রাহ্মণ দূষণীয় নহে, মূত্র পুরীষাদি যোগেও জল দুষ্ট হয় না এবং কোন বস্তুরই দহন ক্রিয়াতে অগ্নির দোষ নাই। দেবগণ, চন্দ্র, গন্ধর্ব্ব সকল ও অগ্নি ইহাঁরা পূর্ব্বে স্ত্রীদিগকে সম্ভোগ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ মানবেরা সম্ভোগ করিতেছে, অতএব তাহারা কদাপি দূষ্য নহে। যদি দৈবাৎ অসবর্ণ সেবায় স্ত্রীলোকের অন্তঃশল্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে যাবৎ শল্য বিমোচন না হয়, তাবৎ নারী অশুদ্ধ থাকে, পরে শল্য বিমোচনানন্তর রজোদর্শন হইলে বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় শুদ্ধ হয়। স্বয়ং প্রতিপন্না বা অন্য কর্ত্তৃক প্রতারিতা অথবা বল দ্বারা কিম্বা চৌর কর্ত্তৃক সম্ভুক্তা দূষিতা নারীকে পরিত্যাগ করিবেক না, অথচ তাহার কামনা পূর্ণও করিবেক না, কিন্তু ঋতু কালে তাহাকে সম্ভোগ করিবেক, যেহেতু পুষ্প কালে নারী শুদ্ধ হয়।

রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাত প্রকার অন্ত্যজ জাতি। জ্ঞানকৃত ইহারদিগের স্ত্রী সম্পর্ক, অন্ন ভোজন ও প্রতিগ্রহ করিলে কৃচ্ছ্রাব্দ ব্রতাচরণ করিবে, অজ্ঞানকৃত হইলে দুই ঐন্দব ব্রতে শুদ্ধ হইবে। পাপাচারী ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক একবার সম্ভুক্ত হইলে ঋতু প্রস্রবণের পর প্রাজাপত্য ব্রতে শুদ্ধি হয়। বল দ্বারা অপহৃত বা প্রতারিত হইয়া একবার সম্ভুক্ত হইলেও প্রাজাপত্য ব্রতে শুচি হয়। ব্রত কাল মধ্যে প্রারব্ধ কর্ম্ম বশত স্ত্রীলোকের যদি রজো যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের তাহাতে কদাচ ব্রত নষ্ট হয় না।

ব্রাহ্মণ মদ্য সংস্পৃষ্ট কুম্ভের জল পান করিলে, কৃচ্ছ্রপাদ ব্রতে শুদ্ধ হয়েন কিন্তু তাঁহার পুনঃ সংস্কার করিতে হয়। অন্ত্যজ জাতিদিগের বৃক্ষের পুষ্প বা ফল ব্রাহ্মণ উপভোগ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডালস্পৃষ্ট জল পান করিলে কৃচ্ছ্রপাদ ব্রতে শুদ্ধ হয়েন, আপস্তম্ব মুনি কহিয়াছেন। শ্লেষ্মা, উপানহ, মূত্র, পুরীষ ও স্ত্রীরজ এবং মদ্য এই সকল দ্রব্য দ্বারা কূপ দূষিত হইলে, তাহার জল পানে প্রায়শ্চিত্ত বিধি কি, তাহা কহিতেছি। ব্রাহ্মণ একাহ ব্রতে, ক্ষত্রিয় দ্ব্যহ ব্রতে, বৈশ্য ত্র্যহ ব্রতে, এবং শূদ্র নক্ত

---

* কি ধর্ম্মানুষ্ঠান, কি ব্যবহারিক কার্য্য, কি রাজ শাসন, হিন্দুদিগের সমুদায় কার্য্যই স্মৃতি-শাস্ত্রের আদেশানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই স্মৃতি-শাস্ত্র কি? অমর সিংহ বলেন "স্মৃতিস্তু ধর্ম্ম-সংহিতা" ধর্ম্ম-সংহিতার নাম স্মৃতি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি বিংশতি জন প্রাচীন ঋষি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থ তৎকালোপযোগী যে সকল শাসন প্রণালী প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায়ই ধর্ম্ম সংহিতা, ধর্ম্ম শাস্ত্র ও স্মৃতি শাস্ত্র বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। সকলেই শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত সেই সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কেহ তাহার বিপরীতাচরণ করিলে হিন্দু সমাজ তাহার প্রতি খড়্গ হস্ত হয়েন। এই নিমিত্তে তৎসমুদায়ের মধ্যে কোন্ বিষয়ের কিরূপ উপদেশ আছে, তাহা সাধারণের বোধ-সুলভ করিয়া দিবার জন্য আমরা অনুবাদ মাত্র করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সমালোচনে প্রবৃত্ত হই নাই, সুতরাং তাহার সমুদায় অংশই আমারদিগকে অনুবাদ করিতে হইবে। অনুবাদ করিতে গেলে, কোন অংশ পরিত্যাগ করা ও কোন অংশ গ্রহণ করা বিধেয় নহে, এই জন্য ইহার মধ্যে যে অশ্লীল ভাগ আছে, তাহা প্রকাশ করা আমারদিগের অনভিপ্রেত হইলেও অগত্যা প্রকাশ করিতে হইতেছে, তদ্বিষয়ের জন্য গুণজ্ঞ লোকের নিকট আমরা কখনই নিন্দনীয় হইব না।

ব্রতে শুদ্ধ হয়েন। দ্বিজগণ প্রমাদ বশত একবার মদ্য পান করিলে দশ রাত্র গোমূত্রের সহিত যবাগু পান করিয়া শুদ্ধ হয়েন। যে দ্বিজ মদ্যপায়ী চণ্ডালের জল পান করেন, দেবতারা তাঁহার হস্তে জল বা হবি গ্রহণ করেন না।

স্ত্রীলোক চিত্তি-ভ্রষ্টা বা ব্যাধি বশত ঋতু-ভ্রষ্টা হইলে প্রাজাপত্য ব্রত ও দশান্যুন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শুদ্ধ হইবেক। যে ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া অগ্ন্যাদি বহন পূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তিন কৃচ্ছ্র ব্রত অথবা চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবেন কিন্তু পরে তাঁহার পুনর্ব্বার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিতে হইবে। যে সকল লোক ব্রহ্ম দণ্ডে হত হয়, তাহারদিগের উদ্দেশে অশৌচ গ্রহণ, উদক দান, শ্মশ্রু ধারণ, অশ্রু মোচন ও উত্তরীয় ধারণাদি করিতে হয় না। যদি কেহ লোক-ভয়ে বা স্নেহ বশত ঐ সকল কার্য্য করে, তাহা হইলে গোমূত্র সহিত যবাগু পান ও এক কৃচ্ছ্র ব্রতে শুচি হয়। শৌচ-স্মৃতি-লুপ্ত বৃদ্ধ যদি পীড়িত অবস্থায় ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিয়া আত্মঘাতী হয়, কিম্বা কোন ব্যক্তি যদি ভৃগু, অগ্নি ও অনশনাদি দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাহার উদ্দেশে ত্রিরাত্র অশৌচ করিবে; আর দ্বিতীয় দিবসে অস্থি সঞ্চয়, তৃতীয় দিবসে উদক দান এবং চতুর্থ দিবসে শ্রাদ্ধ করিবে।

সবৎসা একটি মাত্রও ধেনু যাহার গৃহে নাই, তাহার মঙ্গলই বা কোথায় ও পাপ-ক্ষয়ই বা কিসে হয়। অতি দোহন, অতি বাহন, নাশিকা বেধ অথবা নদী ও পর্ব্বত অবরোধ দ্বারা যদি দৈবাৎ গো-বধ হয়, তাহা হইলে পাদোন ব্রতাচরণ করিবে। আটটি গোরু যে হল বহন করে, তাহাকে ধর্ম্ম হল কহে, ছয়টি গো যোজিত হইলে ব্যবহারিক, চারিটি গো যোজিত হইলে নৃশংশ ও দুইটি যোজিত হইলে গোবধকৃৎ কহা যায়। দুই গোরু যোজিত হল এক প্রহর, চারি গোরু যোজিত হল দুই প্রহর, ছয় গোরু যোজিত হল তিন প্রহর এবং আট গোরু যোজিত হল সমস্ত দিবা বহন করিতে পারিবে। কাষ্ঠ, লোষ্ট বা শিলা দ্বারা দৈবাৎ গো-বধ করিলে কৃচ্ছ্র, শান্তপন ব্রত করিবে, মৃত্তিকা দ্বারা বধ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত এবং লৌহ দ্বারা বধ করিলে অতি কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে ও প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং বৃষ সহিত গো ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক। মৃগ, উষ্ট্র, অশ্ব, সর্প, সিংহ, ব্যাঘ্র ও গর্দ্দভ এই সকল পশু হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। মুষিক, গোধা, নকুল, ভেক ও পক্ষি এই সকল প্রাণি হত্যা করিলে তিন দিন দুগ্ধ পান করিবেক অথবা কৃচ্ছ্রপাদ ব্রত করিবেক। চণ্ডাল-গাত্র বা মূত্র ও পূরীষ স্পর্শ হইলে কিম্বা উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবেক।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

৩৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ১২৪ পৃষ্ঠার পর।

অতি প্রাচীন কালে অস্মদ্দেশে যে রসায়ন শাস্ত্রের বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল, তাহা অষ্টাদশ বিদ্যার প্রধান অঙ্গ স্বরূপ যে আয়ুর্ব্বেদ, তদ্দ্বারাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে। এখানকার পুরাতন গ্রন্থ পুঞ্জের মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র নামধেয় কোন পুস্তক আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যে এদেশে সেই শাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন পুস্তকই ছিল না বা নাই এমত নহে। উক্ত আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভূত রসচন্দ্রিকা নামক এক খানি অনতিবৃহৎ গ্রন্থ আছে, তদ্দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ হই-

তেছে যে অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা যেমন খনিজ মিশ্র পদার্থ রাশি হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ, বঙ্গ বা দস্তা, রাঙ্গ, শীশ, সিম্বুলক্ষার বা শঙ্খবিষ প্রভৃতি ধাতু এবং হীরক, অভ্র ও গন্ধক প্রভৃতি উপধাতু পৃথক্ করিয়া লইতেন, সেই রূপ আবার তৎসমুদায়কে নানা প্রকারে রূপান্তরিত করিয়া চিকিৎসা ও শিল্প কার্য্যের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন (১)। উক্ত রসচন্দ্রিকা গ্রন্থের এক পরিচ্ছেদে ধাতু ও উপধাতু মাত্রের বিবিধ রূপ জারণ, শোধন ও প্রকরণ লিখিত আছে। প্রত্যেক ধাতু ও উপধাতু দৃশ্যতঃ পরিষ্কৃত অবস্থায় থাকিলেও প্রায়শই অন্যান্য ধাতুর কণা সকল তাহার সহিত অলক্ষিত ভাবে জড়িত থাকে। রসচন্দ্রিকার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে প্রত্যেক ধাতু ও উপধাতুকে ঐরূপ অলক্ষিত সংযোগ সকল হইতে বিযুক্ত করা যাইতে পারে। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে ধাতু মাত্রের যেরূপ অক্সাইড্ (অক্সিজেন্ বা অম্লজান বায়ু সংযোগে ধাতু প্রভৃতির রূপান্তরিত অবস্থা) প্রস্তুত হইয়া থাকে, ঐ সকল জারণ প্রকরণ দ্বারাও অস্মদ্দেশীয় বৈদ্যগণ অদ্যাপি সমুদায় ধাতুরই সেই রূপ অক্সাইড্ প্রস্তুত করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধাতু সমস্তের অক্সাইড্ রূপকে তাঁহারা সামান্যতঃ ভস্ম শব্দে কহিয়া থাকেন। উপধাতুর মধ্যে হীরক ও অভ্র জারিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জারিত হইয়া যে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের কিরূপ পদার্থে পরিণত হয়, তাহা আমরা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। এতদ্ভিন্ন, ঐ গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে পারদ ধাতুকে গন্ধকের সহিত রাসায়নিক যোগে মিলিত করিয়া কজ্জলি ও হিঙ্গুল, পারদকে গন্ধক ও কিয়ৎপরিমাণ স্বর্ণের সহিত মিলিত করিয়া স্বর্ণ সিন্দূর এবং উহাকে সামান্য লবণের ক্লোরিণ উপাদানের সহিত মিলিত করিয়া রসকর্পূর প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পারদকে অগ্নি সন্তাপে গন্ধক ও শীশ ধাতুর সহিত মিলিত করিয়া রসসিন্দূর নামক আর একটি চমৎকার সামগ্রীও প্রস্তুত করিবার বিধান আছে। ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রের কজ্জলি ব্লাক-সাল্‌ফিউরেট্ অব্ মার্কুরি (Black sulphuret of mercury) হিঙ্গুল,রেড সাল্‌ফিউরেট অব্ মার্কুরি (Red sulphuret of mercury) এবং রসকর্পূর, পারক্লোরাইড্ অব্ মার্কুরি বা করোসিভ্ সব্লিমেট (Perchloride of mercury or Corrosive sublimate) শব্দে উক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে স্বর্ণ সিন্দূর ও রস সিন্দূরের উপযুক্ত কোন নাম নাই। প্রোক্ত রাসায়নিক পদার্থ সকল কি কি প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা এরূপ সংকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রস্তাবের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক অথচ বাহুল্য হইবে বিবেচনায় এই মাত্র বলিয়াই তৎসম্বন্ধে নিবৃত্ত হওয়া গেল যে, আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রণালী সকল অপেক্ষা সেই সকল প্রণালী কিঞ্চিৎ কঠিন। সারকৌমদী নামক গ্রন্থের বিধানানুসারে বৈদ্যগণ মহাদ্রাবক নামক এক প্রকার ভয়ানক তেজস্বি পদার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ দ্রাবকের দ্রব কারিণী শক্তি এত দুর প্রবল যে ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রের নির্জ্জল সালফিউরিক, নাইট্রিক্ বা মিউরিয়েটিক আসিড প্রভৃতি ভয়ানক দ্রাবক গুলিও তাহার তুলনায় নিস্তেজ বলিয়া বোধ

(১) আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদির লিখনানুসারে স্বর্ণ হইতে সিম্বুলক্ষার পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থ এবং হীরক, অভ্র ও গন্ধক প্রভৃতি পদার্থ যে একমাত্র ধাতু শ্রেণী ভুক্ত, তাহাতে উপধাতু বলিয়া কোন সংজ্ঞা নাই। আমরা আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র অনুসারেই উক্ত পদার্থ গুলিকে ধাতু এবং উপধাতু সংজ্ঞা দিয়া প্রকাশ করিলাম।

হয়। দ্রব কারিণী শক্তি বিষয়ে তাহা ঐ শাস্ত্রের নির্জ্জল নাইট্রোমিউরিয়েটিক [illegible]বক বা একোয়া বিজিয়ার তুল্য। তাহার ঔষধীয় গুণও উক্ত সমুদায় দ্রাবক হইতে ভিন্ন। কি কি উপাদানে ঐরূপ মহাদ্রাবক প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা জানিতে পাইলে ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্র বিশারদ মহোদয়গণ তাহার গুণবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, এই বোধে তাহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রকটিত হইল (২)। উক্ত গ্রন্থের বিধানানুসারে হরিতালের (Realgar) সহিত অভ্র ও স্ফটিকারী মিলিত করিলে রস মাণিক্য নামক একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ প্রস্তুত হয়। রস মাণিক্যের কোন ইউরোপীয় নাম নাই। রস পুষ্প নামধেয় আর একটি অত্যুৎকৃষ্ট রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ গ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে যে উহা প্রস্তুত হয়, তাহা এক্ষণে আমরা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। উহা পারদ ও লবণের ক্লোরিণ পদার্থ রূপ দুইটি উপাদানে নির্ম্মিত হয়। ঐ দুইটি সামগ্রীর প্রস্তুত প্রণালী কিছু কঠিন ও বিস্তৃত বলিয়া তাহা এস্থলে বিবৃত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু উহা ইউরোপীয় রসায়ন শাস্ত্রের ক্লোরাইড অব্ মার্কুরি বা ক্যালামেল (Chloride of mercury or Calomel) পদার্থের সহিত প্রায় তুল্য।

এতদ্ভিন্ন রস চন্দ্রিকা এবং আয়ুর্ব্বেদীয় অন্যান্য গ্রন্থে আরও যে কত প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও রাসায়নিক পদার্থের উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে বর্ণনা করা অসাধ্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে রসচন্দ্রিকা ও সারকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ অধিক প্রাচীন নহে; সুতরাং তৎসমুদায়ে কতিপয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও পদার্থের উল্লেখ আছে বলিয়াই যে এদেশে অতি প্রাচীন কালে রসায়ন শাস্ত্রের বিলক্ষণ অনুশীলন হইয়াছিল, এরূপ বলা অন্যায়। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রবোধার্থ ইহাই বলা আবশ্যক হইতেছে যে, যে সকল রাসায়নিক ব্যাপার উপরে উল্লিখিত হইল এবং যে সমুদায় অনুল্লিখিত রহিল, তত্তাবৎ যে কেবল রসচন্দ্রিকা ও সারকৌমুদীতেই দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনতম গ্রন্থ শুশ্রুত ও চরকাদিতেও ঔষধ বিধান স্থলে উক্ত ধাতু-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ সমুদায়ের প্রয়োগ আছে। রসচন্দ্রিকা ও সারকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ সকল আধুনিক কোন ব্যক্তির রচিত নহে—তৎসমুদায় এরূপ প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের সার সংগ্রহ মাত্র, যাহা বেদ বা মনু সংহিতার রচনা কালেও অস্মদ্দেশীয় ভিষকগণের অবলম্বন স্বরূপ ছিল।

শুদ্ধ অস্মদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদাবলম্বি চিকিৎসকদিগের ঔষধালয়েই যে প্রাচীন রসায়নানুশীলনের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় এমত নহে, প্রত্যেক বাজারের পশারি দোকানেও তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি কেহ কোন সম্পন্ন পশারি দোকানে গিয়া অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে যে অপ-

(২) তুঁতিয়া (Sulphate of copper) শঙ্খ বিষ (Arsenious acid,) নিশাদল (Muriate of ammonia,) গোদন্ত (Sulphuret of arsenic,) প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা, সৈন্ধব (Chloride of sodium,) বিট লবণ (another variety of chloride of sodium) স্ফটিকারী (Sulphate of alumina,) প্রত্যেকের পরিমাণ ৮ তোলা এবং যবক্ষার (Nitrate of Potash) ৩২ তোলা। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মৃত্তিকার কোপাতে পূরিয়া বক যন্ত্রে পাক করিবে। কাঁচের পাত্রে যে ঘর্ম্ম চুয়াইয়া পড়িবে তাহাই মহাদ্রাবক। রসচন্দ্রিকা গ্রন্থে আর এক প্রণালীতে মহাদ্রাবক প্রস্তুত করিবার বিধান আছে।

রিচ্ছন্ন ঝুলি গুলি লম্বমান থাকে. তাহাতে যেমন এদেশ জাত অসংখ্য ঔদ্ভিজ্জ্য ও জান্তব ঔষধ সামগ্রী, তেমনি আবার এদেশ জাত অনেক প্রকার রাসায়নিক পদার্থও রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে তিনি তাহার দোকানে প্রায়শঃই এই সকল ধাতু-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ দেখিতে পাইবেন, যথা, হিরাকস Sulphate of iron, তুঁতিয়া Sulphate of copper, সোহাগা Biborate of soda, রসাঞ্জন Sulphuret of antimony, সৈন্ধব, বিট, সামুদ্র, সচল ও করকচ প্রভৃতি কয়েক প্রকার লবণ (Different varieties of chloride of sodium) খটিকা Carbonate of lime, সাচিক্কার A Salt of soda, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষি, সমুদ্র-ফেণা (এই তিনের ইউরোপীয় রাসায়নিক নাম নাই) নিশাদল Muriate of ammonia, সফেদা Carbonate of lead, যবক্ষার Nitrate of potash, জাঙ্গাল Diacetate of copper, স্ফটিকারী Sulphate of alumina, এবং শ্বেত তুতিয়া Sulphate of zinc, ইত্যাদি (৩)। এতন্মধ্যে হিরাকস হইতে সমুদ্র-ফেণা পর্য্যন্ত যে সকল পদার্থ, তাহা এ দেশের খনি, পর্ব্বত,তট ও হ্রদ প্রভৃতি স্থানে যেরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রায় সেই রূপ অবস্থায়ই আনীত হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়। অপরন্তু, নিশাদল হইতে শ্বেত তুতিয়া পর্য্যন্ত যে সকল সামগ্রী, তাহা খনি প্রভৃতিতে পাওয়া যায় না। তাহা এদেশের নানা স্থানের লোকেরা শিল্পাদি কার্য্যের নিমিত্ত বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এদেশের কোন্ স্থানের লোকেরা কি রূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার কোন্ বস্তু প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহার বর্ণনা এরূপ প্রস্তাবের পক্ষে বাহুল্য মাত্র। এখানকার লোকেরা যে কোন্ সময় হইতে এবম্বিধ রাসায়নিক পদার্থ সকল প্রস্তুত করণ পূর্ব্বক শিল্প কার্য্যে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে, তাহা নিশ্চিত রূপে নিরূপণ করা অসম্ভব ; কারণ এদেশের পুরাতন ইতিহাসে তদ্বিষয়ে বাক্য ব্যয় মাত্রও নাই। ইতিহাসে উক্ত রাসায়নিক বস্তু গুলি সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও তত্তাবতের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণের আর একটি উপায় আছে। যে শিল্প কার্য্য যে সকল রাসায়নিক সামগ্রী ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তাহা এদেশে যে অবধি,ঐ সামগ্রী গুলিও যে এখানে সেই অবধি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, ইহা বলিতে কেহই সঙ্কুচিত হইতে পারেন না। স্বর্ণ রৌপ্যাদি দ্বারা কোন কারু কার্য্য শোভিত অলঙ্কার গঠন করিতে হইলে নিশাদল ও যবক্ষারের নিতান্ত প্রয়োজন ; কেন না তদুভয়ের কার্য্যকারিতা ভিন্ন স্বর্ণ বা রৌপ্যের খণ্ড সকল পরস্পর দৃঢ় রূপে সংযুক্ত হইতে পারে না। এদেশের পট বা প্রতিমা চিত্রে যে শ্বেত ও হরিৎবর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা সফেদা ও জাঙ্গাল দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। চিত্রকরেরা উক্ত দুই পদার্থ আবার হিঙ্গুল, হরিতাল প্রভৃতির সহিত মিলিত করিয়া অন্যান্য বর্ণও প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইউরোপ হইতে এদেশে লোহিত বর্ণ কার্পাস-সূত্র আসিয়া বিক্রীত হইবার পূর্ব্বে এখানেই উক্ত বর্ণের সূত্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এখনও স্থানে স্থানে ঐ রূপ সূত্র অল্প পরিমাণে

(৩) প্রত্যেক পশারি দোকানে উপরোক্ত দ্রব্য গুলি ভিন্ন মুদ্রাশঙ্খ Oxide of lead, রসকর্পূর ও হিঙ্গুলাদিও পাওয়া যায়, কিন্তু তৎসমুদায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত রাসায়নিক দ্রব্য গুলির মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর তত্তাবতের পুনরুল্লেখ হইল না। চিকিৎসা ব্যবসায়ী ভিন্ন এ দেশের অন্যান্য লোকেও শিল্প কার্য্যার্থে ঐ সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে।

প্রস্তুত হইয়া থাকে। কার্পাস-সূত্র উজ্জ্বল লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত এদেশে যত প্রকার সামগ্রী ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে বকম কাষ্ঠ ও ফট্‌কিরীই প্রধান(৪)। এদেশে এই সমুদায় শিল্প যে কত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কি বেদ, কি মনু সংহিতা, কি পুরাণ, যাহাই পাঠ কর, তাহাতেই জানা যাইতে পারে। উক্ত প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে উপরোক্ত কয়েক প্রকার শিল্প ভিন্ন আরও অনেকবিধ শিল্পের উল্লেখ আছে। যখন ঐ সকল শিল্পের প্রাচীনত্ব স্থিরীকৃত হইতেছে, তখন তত্তাবতের উপাদান রূপে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা কখনই আধুনিক হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কোন ব্রাহ্মের বিলাপ!

হায়! আমার আত্মা রূপ পক্ষী সদাই মহৎ ও নির্ম্মল সুখ প্রার্থনা করে, আমি অহরহ কি প্রকারে তাহাকে এই নির্ম্মল ও মহৎ সুখ যোগাইতে পারি? তাহা সামান্য অন্নে তৃপ্ত হয় না, দেব দুর্লভ সুধা পান করিতে সদাই ব্যগ্র। আমি জন্ম দুঃখী; রোগে আতুর, শোকে আকুল ও পাপ তাপে জর্জ্জরিত। আমি এই দেব-দুর্লভ সুধা কি প্রকারে তাহাকে সর্ব্বদা প্রদান করিতে পারি? এই মলিন পৃথিবীতে থাকিয়া আত্মা রূপ সুখের পক্ষীর সুখ-বাসনা কি রূপে পূর্ণ করিব আমি ভাবিয়া অজ্ঞান হইয়াছি। পক্ষী শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে চায় না। শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অনন্ত সুখাকাশে উড্ডীয়মান হইবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিফল যত্ন হইয়া ক্লিষ্ট হয়। হায়! এ পক্ষীর প্রকৃতি বিষয়ে যত আমার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য তাহা করিলাম না। কিছু দিন পরে শরীর রূপ পিঞ্জর ভেদ করিয়া তাহা পলায়ন করিবে। আর কবে এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব? কবে আত্মার মহত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইব? কবে জানিব যে আমি সেই অমৃতের পুত্র, অতএব অমৃতের অধিকারী। কবে অমৃত লাভের জন্য সচেষ্টিত হইব। আত্মার উচ্চ বাসনা সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এখনো এই জ্ঞান আমার হৃদয়ে উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইল না যে পৃথিবী আমার নিবাস নহে; ঈশ্বরই আমার চির বাস স্থান; তিনি আমার পরম গতি, তিনি আমার পরম সম্পদ, তিনি আমার পরম লোক, তিনি আমার পরম আনন্দ।

(৪) হিরাকস তুতিয়া প্রভৃতি খনিজাত পদার্থ দ্বারা যে কি কি শিল্প কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহার উল্লেখ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন; কারণ তৎসমুদায় কোন কালেই এদেশীয়দিগের রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান বর্ত্তমান মাঘ মাসের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

আয় ব্যয়।

অগ্রহায়ণ ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৫২৸৵১৫
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৮৭॥ ৫
সমষ্টি	৫৪০।৶
ব্যয়	২৬২।০
স্থিত	২৭৮ ৶

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৫।৴
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬৯ ৶
পুস্তকালয়	৷৴১৫
যন্ত্রালয়	৫১৸৶
গচ্ছিত	১২৫॥৶
সমষ্টি	২৫২৸৵১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭৭ ৴
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯২।১৫
পুস্তকালয়	১৮৸৵১০
যন্ত্রালয়	৪৬॥৴
গচ্ছিত	২৭।৵১৫
সমষ্টি	২৬২।০

দান প্রাপ্তি।

দানাধারে প্রাপ্ত	৫।৴

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬ ১ মাঘ বুধবার।

Registered No 52.

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
ফাল্গুন ১৭৯৬ শক

৩৭৮ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

সপ্তম খণ্ড।

অথাধ্যাত্মং. বাগেবর্ক্ প্রাণঃ সাম তদেত-দেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে বাগেব সা প্রাণোঽমস্তৎ সাম। ১।

'অথ' অধুনা 'অধ্যাত্মং' উচ্যতে। 'বাক্ এব ঋক্ প্রাণঃ সাম' অধরোপরিস্থানত্বসামান্যাৎ প্রাণো ঘ্রাণ-মুচ্যতে সহ বায়ুনা। 'বাগেব সা প্রাণোঽমঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ১।

এক্ষণে অধ্যাত্ম উপাসনা উক্ত হইতেছে। বাক্যই ঋক্ প্রাণ সাম। সাম রূপ প্রাণ এই বাক্য রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত,এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা বাক্য তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম প্রাণ তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ১।

চক্ষুরেবর্গাত্মা সাম তদেতদেতস্যামৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে চক্ষুরেব সাত্মামস্তৎ সাম। ২।

'চক্ষুঃ এব ঋক্ আত্মা সাম' আত্মেতি ছায়াত্মা তৎস্থত্বাৎ সাম, অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ২।

চক্ষুই ঋক্ আত্মা সাম। সাম রূপ আত্মা এই চক্ষু রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা চক্ষু তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম আত্মা তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ এক-ত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ২।

শ্রোত্রমেবর্ঙ্মনঃ সাম তদেতদেতস্যামৃচ্য-ধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে শ্রো-ত্রমেব সা মনোঽমস্তৎ সাম। ৩।

'শ্রোত্রং এব ঋক্ মনঃ সাম' শ্রোত্রস্যাধিষ্ঠাতৃত্বান্ম-নসঃ সামত্বং। অপরং পূর্ব্ববৎ। ৩।

শ্রোত্রই ঋক্ মন সাম। সাম রূপ মন এই শ্রোত্র রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋ-কের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা শ্রোত্র তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম মন তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৩।

অথ যদেতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈবর্গথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তৎ সাম তদেতদেতস্যা-মৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম তস্মাদৃচ্যধ্যূঢ়ং সাম গীয়তে অথ যদেবৈতদক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈব সাথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং তদমস্তৎ সাম। ৪।

'অথ যৎ এতৎ অক্ষ্ণঃ শুক্লং ভাঃ সৈব ঋক্ অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণং' আদিত্যইব দৃক্‌শক্ত্যধিষ্ঠানং 'তৎ সাম' অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। ৪।

অনন্তর চক্ষুতে যে শুক্লবর্ণ দীপ্তি তাহাই ঋক্ আর যে নীল অথচ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহাই সাম। নীলবর্ণ দীপ্তি রূপ সাম এই শুক্লবর্ণ দীপ্তি রূপ ঋকের উপরে অবস্থিত, এই হেতু ঋকের উপরে সাম গান হইয়া থাকে, এই নিমিত্তে সাম শব্দের অর্দ্ধ যে সা চক্ষুর শুক্লবর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য এবং অপরার্দ্ধ যে অম চক্ষুর কৃষ্ণবর্ণ দীপ্তি তাহার বাচ্য। এই দুই অর্দ্ধ একত্রিত করিয়া সাম শব্দ হয়। ৪।

অথ যএষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে সৈবর্ক্ তৎসাম তদুক্থং তদ্‌যজুস্তদ্‌ব্রহ্ম তস্যৈ-তস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম। ৫।

'অথ যএষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। 'সৈব ঋক্' অধ্যাত্মং বাগাদ্যা পৃথিব্যাদ্যা চ অধিদৈবতং। প্রসিদ্ধা চ ঋক্ পাদবদ্ধাক্ষরাত্মিকা, তথা সামোক্থসাহচর্য্যাদ্বা স্তোত্রং সাম, ঋক্ শস্ত্রং উক্থা-দন্যৎ, তথা যজুঃ স্বাহা স্বধা বষড়াদি সর্ব্বমেব বাক্ যজুস্তৎসএব সর্ব্বাত্মকত্বাৎ সর্ব্বযোনিত্বাচ্চ 'তদ্ব্রহ্ম' ইতি ত্রয়োবেদাঃ 'তস্য এতস্য' চাক্ষুষস্য পুরুষস্য 'তদেব রূপং' অতিদিশ্যতে কিং তৎ 'যৎ অমুষ্য' আদিত্য-পুরুষস্য হিরণ্ময়ইত্যাদি অধিদৈবতমুক্তং 'যৌ অমুষ্য গেষ্ণৌ' পর্ব্বণী তাবেব অস্যাপি চাক্ষুষস্য 'গেষ্ণৌ' 'যৎ' চ অমুষ্য 'নাম' উদিতি উদ্‌গীথ ইতি চ 'তৎ' এব অস্য 'নাম'। ৫।

অনন্তর, চক্ষুর মধ্যে যে এই পুরুষ দেখা যায়, তিনিই ঋক্, তিনি সাম, তিনি উক্থ, তিনি যজু, তিনি ব্রহ্ম। পূর্ব্বোক্ত আদিত্য পুরুষের যে প্রকার রূপ এই চাক্ষুষ পুরুষেরও সেই প্রকার রূপ, যেমন তাঁহার পর্ব্ব সেই রূপ ইহাঁরও পর্ব্ব, তাঁহার যে নাম ইহাঁরও সেই নাম। ৫।

সএষ যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চোলোকাস্তেষা-ঞ্চেষ্টে মনুষ্যকামনাঞ্চেতি তদ্য ইমে বীণায়াং গায়ন্ত্যেতং তে গায়ন্তি তস্মাত্তে ধনসনয়ঃ।৬।

'সঃ এষঃ' চাক্ষুষঃ পুরুষঃ 'যে চ এতস্মাৎ' আধ্যা-ত্মিকাদাত্মনঃ 'অর্ব্বাঞ্চঃ' অর্ব্বাগ্‌গতাঃ 'লোকাঃ' 'তেষা-ঞ্চেষ্টে' মনুষ্যসম্বন্ধিনাঞ্চ কামানাং 'তৎ' তস্মাৎ 'যে ইমে বীণায়াং গায়ন্তি' গায়কাঃ 'তে' 'এতমেব গায়ন্তি' 'তস্মাৎ তে ধনসনয়ঃ' ধনলাভযুক্তাঃ ধনবন্ত ইত্যর্থঃ।৬।

ইহাঁ হইতে অধস্থ যে সকল লোক ইনি তা-হারদিগকে ও মনুষ্যগণের কামনা সকলকে নিয়-মিত করেন। গায়কেরা বীণাতে যে গান করে, সে ইহাঁকেই গান করে, এই নিমিত্তে তাহারা ধন-বান্ হয়। ৬।

অথ যএতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়ত্যুভৌ স গায়তি সোঽমুনৈব সএবযে চামুষ্মাৎ পরা-ঞ্চোলোকাস্তাংশ্চাপ্নোতি দেবকামাংশ্চ। ৭।

'অথ যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্' যথোক্তং এবং উদ্‌-গীথং বিদ্বান্ 'সাম গায়তি' 'উভৌ সঃ গায়তি' চাক্ষুষং আদিত্যঞ্চ। তস্যৈবং বিদঃ ফলমুচ্যতে 'সঃ অমুনা এব' আদিত্যেন 'সঃ এষঃ যে চ অমুষ্মাৎ পরাঞ্চঃ লোকাঃ তান্ চ আপ্নোতি' আদিত্যান্তর্গতদেবোভূত্বেত্যর্থঃ 'দেব-কামান্ চ'। ৭।

অনন্তর যে ব্যক্তি ইহাঁকে এই প্রকার জানিয়া সাম গান করেন, তিনি চাক্ষুষ পুরুষ ও আদিত্য পুরুষ উভয়েরই গান করেন এবং আদিত্য হইতে উপরিস্থ যে সকল লোক আদিত্যের সহিত সেই সকল লোক ও দেবতাদিগের কামনা তিনি আ-দিত্য দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন। ৭।

অথানেনৈব যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চোলোকা-স্তাংশ্চাপ্নোতি মনুষ্যকামাংশ্চ তস্মাদু হৈবং-বিদুদ্‌গাতা ব্রূয়াৎ। ৮।

'অথ অনেনৈব' চাক্ষুষেণৈব 'যে চ এতস্মাৎ অ-র্ব্বাঞ্চঃ লোকাঃ তান্ চ আপ্নোতি মনুষ্যকামান্ চ' চাক্ষুষো ভূত্বেত্যর্থঃ। 'তস্মাৎ উ হ এবংবিৎ উদ্‌গাতা ব্রূয়াৎ' যজমানং। ৮।

ইহাঁ হইতে অধস্থ যে সকল লোক ইহাঁর সহিত সেই সকল লোক ও মনুষ্যদিগের কামনা তিনি ইহাঁর দ্বারা প্রাপ্ত হয়েন। সেই নিমিত্তে যে উদ্‌গাতা এইরূপ জানেন, তিনি যজমানকে ইহা কহিবেন। ৮।

কন্তে কামমাগায়ানীত্যেষ হ্যেব কামা-গানস্যেষ্টে যএতদেবং বিদ্বান্ সাম গায়তি সাম গায়তি। ৯।

কিং ব্রূয়াৎ তদাহ 'কং' ইষ্টং 'তে' তব 'কামং আগায়ানি ইতি' 'এষঃ হি' যস্মাদুদ্‌গাতা 'কামাগানস্য' উদ্‌গানেন কামং সম্পাদয়িতুং 'ইষ্টে' সমর্থঃ কোসৌ 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি' দ্বিরুক্তিরুপাসন-সমাপ্ত্যর্থা। ৯।

তোমার কোন্ কামনা আমি গান করিব? যেহেতু যে উদ্গাতা এইরূপ জানিয়া সাম গান করেন, তিনি গান দ্বারা কামনা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন। ৯।

পঞ্চচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ শনিবার ১৭৯৬ শক।

প্রাতঃকাল।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা।

আহা! অদ্য এই সমাজ মন্দির কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে, কি শান্তি-রসে পরিপূর্ণ হইয়াছে! এখন আমার মনোমধ্যে যে কি অনির্ব্বচনীয় এক প্রকার অদ্ভুত ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা বাক্যেতে বর্ণনা করিতে পারিতেছি না। সমাসীন ব্রাহ্মগণের মুখ-মণ্ডলে উৎসাহ ও আনন্দের চিহ্ন দেখিয়া আমার মন উল্লাসে পরিপূর্ণ হইতেছে। অদ্য কি আনন্দের দিন সমাগত হইয়াছে? পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, প্রতি বৎসরই এই মাঘ মাসের একাদশ দিবস আগত হইতেছে, তথাপি আমারদিগের নিকট ইহা প্রতি বর্ষেই নূতন বেশ ধারণ করিয়া আগমন করে, কোনমতেই পুরাতন বোধ হয় না,—কোন প্রকারেই ইহার নূতনত্ব বিলুপ্ত হয় না। ১৭৫১ শকের মাঘ মাসের এই একাদশ দিবসে এদেশে যে কি অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব বৃক্ষের অঙ্কুর আরোপিত হইয়াছিল, আমরা অদ্যাপি তাহার অমৃত ফল আস্বাদ করিয়া সুখলাভে পরিতৃপ্ত হইতেছি এবং ভবিষ্যৎকালবর্ত্তি লোকেরাও অব্যাহত চিত্তে ইহা লাভ করিয়া যে সুখী হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

মনুষ্য মাত্রের অন্তঃকরণে এই অভিলাষ যে নিরন্তর সুখ হউক, দুঃখ যেন লেশ মাত্রও না হয়। কিন্তু কয় ব্যক্তি প্রকৃত সুখের পরিচয় পাইয়াছে? কত লোকে সুখান্বেষণে সমস্ত জীবন ক্ষয় করে। কেহ বা অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর বিষয় রাশিকে স্থায়ী সুখের কারণ জানিয়া তাহাতেই হৃদয় মন সমর্পণ করে। তাহারা দেখিয়াও দেখে না যে আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরই নিত্য ও নিরতিশয় সুখের আস্পদ। ধনী কি দরিদ্র, পণ্ডিত কি মূর্খ, স্ত্রী কি পুরুষ, এই সুখ রত্ন উপার্জ্জন করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। ঈশ্বরকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত সুখে সুখী হইতে পারি। সেই প্রকৃত সুখ লাভের এক মাত্র উপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম। সাংসারিক দুঃখ বিপত্তির মধ্যে আত্মাকে সুখী করিবার নিমিত্তেই ঈশ্বর আমারদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক মাত্র সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণের সাধারণ—অবিভাজ্য সম্পত্তি। ইহা উন্নত প্রাসাদে রাজার সম্পত্তি, পর্ণকুটীরে দরিদ্রের সম্পত্তি, গ্রন্থালয়ে পণ্ডিতের সম্পত্তি এবং বর্ণ-জ্ঞান-শূন্য কৃষকেরও সম্পত্তি। ইহা দেশ বিশেষ কি কাল বিশেষ কি জাতি বিশেষ কি অবস্থা বিশেষ কি সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ নহে। ইহা সকলেরই নিজস্ব ধন। ইহা প্রত্যেকের আত্মাতেই মুদ্রিত রহিয়াছে। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার উপদেষ্টা। ইহা অনন্ত কাল স্থায়ী, সুতরাং ভূত ভবিষৎ বর্ত্তমান কালের মনুষ্য মাত্রেরই ইহাতে সম্পূর্ণ অধিকার। ইহা সকল আত্মাকেই সেই মহান্ আত্মার সহিত যোগ নিবদ্ধ করিয়া ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ করে।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনুস্যূত করিয়া প্রকৃতির মধ্যেই ইহাকে নিয়মিত করিয়াছেন। বুদ্ধি-বৃত্তি ও অন্তরাত্মার সহায়তায় অনুসন্ধানে অবগাহন

করিলে আপনার প্রকৃতির মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্মের স্নিগ্ধকর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর আপনার স্বরূপ লক্ষণে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অবয়ব সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং সত্য স্বরূপ, তাঁহার ধর্ম্মও নিরতিশয় সত্য। তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মও কখন বিকৃত হইবার নহে। তিনি সকল দেশ ও সকল কালে বিদ্যমান, তাঁহার ধর্ম্মও দেশ কালে আবদ্ধ হয় না। তিনি ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, সকলেরই নিকট নির্ব্বিশেষ ভাবে অবস্থান করেন, তাঁহার ধর্ম্মও সেই রূপ। তিনি স্বয়ং উদার, তাঁহার ধর্ম্মও তদ্রূপ। তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ, তাঁহার ধর্ম্মেও অপূর্ণ ভাবের লেশ মাত্র নাই। যাহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অপূর্ণ মনে করে, তাহারা ঈশ্বরকেই অবমাননা করে। যাহারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মের দোষানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ঈশ্বরের স্বরূপেই দোষারোপ করিয়া থাকে। মনুষ্যের নিজের অপূর্ণতা যতই হ্রাস হইতে থাকিবে, ততই সে ইহার জীবন্ত পূর্ণভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিতে পারিবে।

এই ঈশ্বর-দত্ত বিশ্বজনীন পূর্ণ ধর্ম্ম আমাদিগের পৈতৃক ধর্ম্ম। আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ শান্ত-প্রকৃতি প্রাচীন ঋষিদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান হইতেই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিনিঃসৃত হইয়াছে। আমরা যত কাল জীবিত থাকিব, দেহের ছায়ার ন্যায় ততকাল ইহা আমারদিগের সহচর থাকিবে—কস্মিন্‌কালে ইহাকে প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিব না। অতএব সেই পুরাতন ঋষিদিগের ন্যায় আমাদেরও শান্ত-প্রকৃতি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। শান্ত সমাহিত না হইলে ঈশ্বরের স্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাত হয় না। আমারদিগের দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে না পারিলে আমরা কখনই ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইব না। ঋষিরা পুনঃ পুন বলিয়া গিয়াছেন, শান্ত সমাহিত না হইলে কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা ঈশ্বরকে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।" ঋষিরা ঈশ্বরকে শান্তভাবে উপাসনা করিতেন, অথচ ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদিগের প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। আমরা তাঁহাদিগের অনুকরণে শান্তভাবে—পবিত্রভাবে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইলেই তিনি আমারদিগকে আলিঙ্গন করিবেন।

ঈশ্বরের উপাসনায় বিবেক ও বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বিবেক যেমন আত্মাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া—পবিত্র করিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ঈশ্বরের জন্য প্রস্তুত করে, বৈরাগ্যও সেই রূপ আত্মাকে মোহ ও সংসারাশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পরলোকের জন্য—অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। সংসারের কি মোহিনী শক্তি! বিষয়ের কি অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ! তাহারদিগকে অস্থায়ী জানিয়াও তাহারদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা তাহাতেই জীবন মন সমর্পণ করিতেছি। কিন্তু যখন আমরা বিবেক ও বৈরাগ্যের আশ্রয় লই, তখনি সংসারের অনিত্যতা ও বিষয়ের অপূর্ণতা সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাদের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করি এবং প্রকৃত কল্যাণের উদ্দেশে ব্রহ্ম সাধনে প্রবৃত্ত হই।

হে করুণাময় পবিত্র পরমেশ্বর! আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তোমারি প্রদত্ত এই জীবন তোমার পবিত্র চরণে প্রত্যর্পণ করিতে সমাগত হইয়াছি। হে জীবন নাথ! আমি বার বার পরীক্ষায় জানিতেছি, যে, তোমা-ভিন্ন যে জীবন, তাহা মৃত্যু-সমান, তথাপি কেন আমি পুনঃ পুন সংসারে মুগ্ধ

হই, দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। হে জ্যোতির জ্যোতি! তুমি সেই অন্ধকার হইতে আমাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে লইয়া যাও। তোমার নিকট এই প্রার্থনা যে আমি যেন তোমাকে করতলন্যস্ত ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ রূপে লাভ করিতে পারি। হে অন্তর্যামি অমৃত পুরুষ। আমি আমার নিজ আত্মার ক্রটি সকল আলোচনা করিয়া তাহারদিগকে ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং শ্রদ্ধার সহিত তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা কুসুমের অঞ্জলি দিবার জন্য তোমার দ্বারে উপনীত হইয়াছি, তুমি আমাকে বিবেক ও বৈরাগ্য বলে শান্ত সমাহিত করিয়া তোমার স্বরূপ দর্শনে অধিকারী কর এবং মুক্তির সোপান প্রদর্শন কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

আজ আমারদিগের মহোৎসব—আজ বঙ্গদেশ আনন্দ-ধ্বনিতে পরিপূরিত হইয়াছে—চতুর্দ্দিকেই মঙ্গল গীত গগনকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। এই জন-সমাকীর্ণ সভা, এই আলোকময় প্রাঙ্গন যে মহানন্দের পরিচয় দিতেছে, সেই আনন্দের আকর কোথায়? এই মহোৎসব কিসের নিমিত্ত? এই আনন্দের আকর জড় জগতে নাই, এই মহোৎসবের কারণ পার্থিব কোন বিষয় নহে। এই আনন্দের মূল সেই পরমানন্দে নিহিত রহিয়াছে; ইহার কারণ সেই আদি কারণ অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর, তাঁহার পূজাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। কিন্তু যিনি কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন—যিনি কেবল এই আলোকময় সভার শোভা সন্দর্শনেই আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেছেন—যিনি কেবল বাহিরের আনন্দেই পুলকিত হইতেছেন—যিনি কেবল এই জন-সমাকীর্ণ সভার বাহ্য আড়ম্বরকেই অদ্যকার উৎসবের শেষ মনে করিতেছেন; তিনি এই মহোৎসবের প্রকৃতভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই—তিনি মণি মুক্তাদি অন্বেষণে সমুদ্র তীরে আসিয়া অগাধ জলধি জলের উপরে ভাসিতেছেন মাত্র, রত্নগর্ব্ভের তল স্পর্শ করিয়া রত্ন রাজি সংগ্রহে বঞ্চিত রহিয়াছেন—চিরপোষিত আশার সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এই সমস্ত বাহ্য শোভা, বাহিরের উল্লাস, আত্মার সৌন্দর্য্যের—আমাদিগের মূল আনন্দের ছায়া মাত্র, তাহা প্রকৃত পদার্থ নহে। ভ্রমান্ধ হইয়া ছায়াকে প্রকৃত পদার্থ জ্ঞান করিলে আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধনের আশা বিফল হইবে। যে আলোক ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যে আনন্দের দ্বারা আত্মা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, যে সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ অনন্ত দেশব্যাপী ও অনন্ত কাল স্থায়ী, তাহার প্রাপ্তিই আমাদিগের অদ্যকার মহোৎসবের উদ্দেশ্য। ঈশ্বর-জ্যোতির্দ্বারা আত্মাকে আলোকিত করিবার ও ঐশ্বরিক ভাবে আত্মাকে পরিপূরিত করিবার নিমিত্তই আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি। বাহিরের আলোক প্রহর কাল পরেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, ক্ষণ বিলম্বে এই কোলাহল পরিপূর্ণ সভা নিস্তব্ধ ও জন শূন্য হইবে; কিন্তু ঈশ্বরালোকে প্রদীপ্ত আত্মা কখনই তমসাচ্ছন্ন হইবে না, ঈশ্বর ভাবে পুলকিত আত্মা কখনই নিরানন্দ হইবে না, ঈশ্বর-প্রেমপূর্ণ হৃদয় কখনই শূন্য হইবে না। সেই আলোক এক্ষণে যাঁহাদিগের আত্মাকে আলোকিত করিতেছে, যাঁহাদিগের মনে ঈশ্বর-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইতেছে, যাঁহাদিগের নিমীলিত নয়ন আত্মার অন্তরতম প্রদেশে

সেই জ্যোতির্ম্ময়ের অচিন্ত্য অব্যক্ত শোভা দৃষ্টি করিতেছে, যাঁহাদিগের আত্মা ঈশ্বর-প্রেমে পূর্ণ হইয়াছে, যাঁহারা আপন আপন আত্মাতে সেই পরমাত্মার পূর্ণ প্রীতি ও মঙ্গল ভাব ধারণ করিয়াছেন, যে পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দকে জীব সকল উপভোগ করে, সেই পরমানন্দে যাঁহাদিগের আত্মা পুলকিত হইয়াছে, তাঁহারাই অদ্যকার এই মহোৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ইহার যথার্থ ফলোপভোগী। এই দীপমালার আলোক এই মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাণ হইতে পারে, পৌর্ণমাসির সুধাংশুর সুশীতল কর রাশির হ্রাস হইতে পারে, উজ্জ্বল নক্ষত্র মণ্ডলী দীপ্তি-হীন হইতে পারে; দিবাকরের প্রখর জ্যোতিঃ ম্রিয়মাণ হইতে পারে, সৌরজগৎ এক কালে তমসাচ্ছন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেই নিত্য নিরঞ্জন পবিত্র জ্যোতিঃ যে আত্মাতে প্রকাশিত হইয়াছে, সে আত্মা কখনই আলোক-শূন্য হইবে না, তাহার আনন্দের কখনই হ্রাস হইবে না।

এই অনন্ত আনন্দের—এই পূর্ণ জ্যোতির উল্লেখ এখানে কি নিমিত্ত করিতেছি; সেই পরমানন্দের সহিত অদ্যকার এই মহোৎসবের কি সম্বন্ধ? তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে প্রবেশ করিবার প্রথম উদ্যমেই দেখিতে পাই যে "ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে"। ব্রহ্মজ্ঞানকে অগ্নির সহিত কি নিমিত্ত তুলনা করা গেল, উভয়ের মধ্যে কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে? তাহাতে দৃষ্ট হয় যে অগ্নির গুণ ত্রিবিধ এবং সেই তিনটি গুণই ব্রহ্মজ্ঞানে বর্ত্তমান আছে। অগ্নির প্রথম গুণ উত্তাপ দান; উত্তাপ না থাকিলে জড় জগতে কি জীব কি উদ্ভিদ কিছুই জীবিত থাকিতে পারিত না। সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মা জীবিত থাকিতে পারে না; ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মার জীবন, ইহাই আত্মার প্রাণ বায়ু, ব্রহ্মজ্ঞান শূন্য আত্মা নির্জীব চেতনাবিহীন অসার পদার্থ। যদি ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যের আত্মা আছে এ কথা বলিতে পারিতাম না। এই নিরুপম স্বর্গীয় ব্রহ্মজ্ঞানই মনুষ্যকে পশু হইতে প্রভেদ করে এবং আমাদিগকে মনুষ্য নামের যোগ্য করে।

অগ্নির দ্বিতীয় গুণ জ্যোতিঃ অগ্নির এই গুণের প্রভাবেই অন্ধকার দূর হয় এবং তমসাচ্ছন্ন জগৎ আলোক প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা আত্মার অন্ধকার নষ্ট হয়। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মা যে আলোক প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হই। সেই স্বর্গীয় আলোকই আমাদিগের হিতাহিত জ্ঞানের প্রধান কারণ। ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা পাপ ও পুণ্যের ইতর বিশেষ করিতে বা পুণ্য পথের পথিক হইতে সমর্থ হই না। অন্ধের দীপ যে প্রকার অকর্ম্মণ্য ব্রহ্মজ্ঞানালোক-বিহীন আত্মার পক্ষে পাপপুণ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্ব্বাচনও সেই রূপ ফল-হীন।

অগ্নির তৃতীয় গুণ দাহিকা শক্তি। এই শক্তি প্রভাবে অসার অপদার্থ দ্রব্য সমস্ত দগ্ধ হয় খনিস্থ স্বর্ণ অগ্নি স্পর্শে কৃত্রিমতার ভাগ পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত হয় এবং উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবেও সেই রূপ আত্মার মালিন্য দূর হয়, ইহার প্রভাবেই মানবাত্মা কপটতা ও অসার পদার্থ সমস্ত ত্যাগ করত বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয় এবং পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বীয় স্বাভাবিক সমুজ্জ্বল কান্তি ধারণ করে। যিনি ভূমা এবং মহান্, ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধক তাঁহাকে আত্মাতে আবির্ভূত দেখিয়া আর ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য শোক করেন না।

যদিও এই প্রকার বিবিধ ফল-প্রদায়ক সর্ব্ব গুণাকর স্বর্গীয় ব্রহ্মজ্ঞান সকলের হৃদয়ে নিহিত আছে, এবং ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব সকলের আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু যেমন কেবল মাত্র অগ্নির সত্ত্বাতে তাহার গুণত্রয় উপলব্ধ হয় না, তাহাকে কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত তাহাকে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত রাখা আবশ্যক, যেমন কেবল মাত্র পুস্তকস্থিত বাক্যের দ্বারা মনুষ্যেরা উপকার প্রাপ্ত হয় না, তাহা পাঠ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় দেখা যায়, সেই রূপ মানব-হৃদয়-নিহিত ব্রহ্মজ্ঞানকে সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত না রাখিলে,—আত্মাতে লিখিত অবিনশ্বর অক্ষর গুলি সর্ব্বদা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ না করিলে তাহা ফলদায়ক হয় না। যাহাতে বঙ্গবাসীগণ এই স্বর্গীয় অগ্নিকে স্বীয় হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত রাখিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদিগের আত্মা ঈশ্বর ভাবে পরিপুরিত ও সেই অনাদি অনন্ত জ্যোতির্ম্ময়ের বিমল নিত্য জ্যোতিতে সর্ব্বদা প্রদীপ্ত থাকিয়া দেশ বিদেশে বিশুদ্ধ আলোক প্রকাশ করিতে পারে এবং যাহাতে আমাদিগের আত্মার মালিন্য দূর ও পাপরাশি ভস্মীভূত হয়, এই নিমিত্ত পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর গত হইল মাঘ মাসের একাদশ দিবসে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। বঙ্গবাসিগণকে পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার পথ যে দিবস প্রথম উদ্ভাবিত হয়, যে দিনে বঙ্গবাসিগণের আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যের প্রথম সূত্রপাত হয়, সেই দিবসকে চির-স্মরণীয় রাখিবার নিমিত্ত এই পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ কাল প্রতি বৎসর ১১ মাঘে ব্রাহ্মগণ এই প্রকার মহোৎসবে উৎসাহিত হয়েন, এই প্রকার মহানন্দে পরিপূরিত হইয়া উষা কাল হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্ব-মঙ্গল-স্বরূপ পরমপিতা বিশ্ব-বিধাতার পূজায় ও পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন। অদ্য আমাদিগের পুনরায় সেই দিন উপস্থিত, ইহার পূর্ব্বেও যদি কখন দয়াময় পিতাকে ভুলিয়া থাকি, যদি তাঁহার নিয়মিত ধর্ম্মপালনে উপেক্ষা করিয়া থাকি, যদি তাঁহার আহ্বানে মনোযোগ না দিয়া থাকি; কিন্তু অদ্য কোন মতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিব না। কোন ব্রাহ্মের হৃদয় এখনও এরূপ শুষ্ক হয় নাই যে অদ্য ভক্তি রসে আর্দ্র না হইবে; ব্রাহ্মের আত্মা এখনও এরূপ কঠোর হয় নাই যে অদ্য ঈশ্বর-প্রেমে পরিপূরিত না হইয়া ক্ষান্ত থাকিবে। ঈশ্বর-প্রদত্ত প্রাকৃতিক সহানুভূতি মানব আত্মাতে এতই প্রবল যে ভক্তি-রসে হৃদয়কে পূর্ণ না করিয়া যদিও কেহ এখানে আসিয়া থাকেন, এখন পর্য্যন্তও যদ্যপি কাহারও আত্মা ঈশ্বরের নিমিত্ত—আমাদিগের জীবনের জীবনের নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়া থাকে, এখনও যদি কাহারও আত্মা শূন্য হইয়া থাকে; তাহা হইলেও ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের আন্তরিক প্রীতি ও প্রেম পূর্ণ হৃদয় দৃষ্টে তাঁহার আত্মা ক্ষণ কাল মধ্যেই যে উপাসনার ভাবে পরিপূরিত ও পরম পিতা পরমেশ্বরের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইবে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। এক জনের অকৃত্রিম আন্তরিক প্রীতি শত শত ব্যক্তির আত্মাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইতে পারে, এক জনের পবিত্র উৎসাহ সহস্র সহস্র ব্যক্তির আত্মাকে উৎসাহে পরিপূরিত করিতে পারে। তবে যখন এখানে শত শত ব্যক্তিকে ঈশ্বর-প্রেমে ও ভক্তি রসে পরিপূর্ণ দেখিব, সহস্র সহস্র ব্যক্তির মুখে আনন্দের ও উৎসাহের চিহ্ন প্রতিভাত দেখিব, ভূমা ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুলতা সকল হৃদয়েই প্রকাশিত হইবে, তখন আর আমাদিগের আত্মা কখনই ঔদাস্য বা নিরুৎসাহের ভাব অবলম্বন করিতে পারিবে না,

সকলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর প্রেমে মগ্ন হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন। কিন্তু ক্ষণ কালের নিমিত্ত এই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিলেই কি আমাদিগের অদ্যকার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে? মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও আত্মাকে ঈশ্বর-ভাবে পরিপূরিত করার ফল সামান্য নহে, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রহর কাল বা এক দিবস ঈশ্বরে অর্পিত হইলেই যে আমাদিগের কর্ত্তব্যের শেষ হইল,—সেই স্বল্প কালের নিমিত্ত আত্মা পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেই যে আমাদিগের চির জীবনের লক্ষ্য সংসাধিত হইল—পাদ মাত্র গমন করিতে পারিলেই যে অনন্ত পথের দুরতার পর্য্যবসান হইল—এক দিবসের অন্ন পানেই যে চির দিনের ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হইল, এমন কথা আমরা কখনই মনে করিতে পারি না। তবে কি এই মহোৎসাহ, অদ্যকার এই পূর্ণ প্রীতি ও অপার আনন্দ নিষ্ফল? তবে কি এসমুদায়ই অকর্ম্মণ্য? কোন মতেই নহে। ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, ইহার গূঢ় ভাব হৃদয়ে ধারণ কর, এখনই বুঝিতে পারিবে যে করুণাময় পিতা কি অভেদ্য অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলের দ্বারা অতীব সূক্ষ্ম পদার্থ সকলকে অনন্তের সহিত বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—আমাদের প্রতি দিবসের, প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্যের সহিত আমাদিগের অনন্ত জীবনের সুখ শান্তি ও উন্নতির সংযোগ বিধান করিয়াছেন; কি আশ্চর্য্য কৌশলে অদ্যকার এই মহোৎসবকে আমাদিগের নিত্য নির্ম্মল আনন্দের সোপান করিয়াছেন। যাঁহার আত্মা ঈশ্বর ভাবে কখন পরিপূরিত হয় নাই; যে হৃদয় পরম কারুণিক পিতার অপার করুণা ও পূর্ণ মঙ্গল ভাব কখন অনুভব করে নাই; যে ব্যক্তি সেই পরমানন্দের কণা মাত্র আনন্দ কখন উপভোগ করেন নাই, ঈশ্বরের নিমিত্ত ব্যাকুলতা ও তাঁহার পূর্ণ-প্রেম সম্ভোগের বলবতী ইচ্ছা তাঁহার আত্মাতে কখনই স্থান পায় না। কিন্তু অদ্যকার এই মহোৎসবে যখন তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের পরম মঙ্গল স্বরূপের ভাবে পরিপূরিত হইবে, যখন তাহা সেই অপার আনন্দের সুমধুর স্বাদ প্রাপ্ত হইবে, যখন প্রীতি ও প্রেম পূর্ণতার অসদ্ভাব দুরীকৃত হইয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ ব্রহ্মানন্দের উপভোগী করিবে, যখন ঈশ্বর-জ্যোতিঃ তমসাচ্ছন্ন আত্মার অন্ধকার দূর করত হীন চিন্তা ও দুর্ব্বল আকাঙ্ক্ষা সমূহের অসারতা দেখাইয়া দিবে; তখন কি আর তিনি মুহূর্ত্তের নিমিত্তও ঈশ্বরকে ভুলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন? তখন, এত দিন যে জীবনের জীবন শূন্য হইয়া বৃথা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তজ্জন্য প্রবল আত্মগ্লানিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকিবে; স্বর্গীয় অনুতাপ আত্মার অসারতা ও চিত্তের জঘন্য ভাব সমুদায় দগ্ধ করিয়া তাহাকে পূর্ণ প্রীতি ও পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগের উপযোগী করিবে এবং পথ-ভ্রান্ত পথিককে সৎপথে আনয়ন করিয়া ঈশ্বর-প্রীতির মনোহর কান্তি ও নিরুপম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে থাকিবে। আমরা সকলে তখন পূর্ণ-প্রীতি ও ঈশ্বরের অপার করুণা উপভোগে বিগত-শোক হইয়া প্রেম-পূর্ণ ও পবিত্র হৃদয়ে আধ্যাত্মিক অসীম আনন্দ ও নিত্য শান্তি লাভ করিব এবং যাহাতে সেই পরমানন্দ ও বিশুদ্ধ শান্তি ইহ লোকে ও পরলোকে চিরকাল সমভাবে সম্পূর্ণ রূপে উপভোগ করিবার উপযুক্ত হই, তজ্জন্য অহরহ পরম পিতার অপার করুণা ও পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত থাকিব এবং ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ ও তাঁহাতে পূর্ণ প্রীতি অর্পণ করতঃ যাহাতে সকল কালে, সকল অবস্থাতে, সর্ব্বা-

ন্তঃকরণের সহিত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে রত থাকিয়া প্রকৃত রূপে পবিত্র ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারি তজ্জন্য সচেষ্ট ও কৃত-সংকল্প হইব।

অদ্যকার মহোৎসবের এপ্রকার মাহাত্ম্য; ইহার সহিত আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য সাধনের উপায়ের এরূপ গূঢ় সম্বন্ধ। এই উৎসবের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক দিকে যেমন আমরা আমাদিগের বিগত জীবনের অসারতা ও ঈশ্বর-শূন্যতা দৃষ্টে শোক-সন্তপ্ত হই, অতীত কালের পাপের নিমিত্ত আত্ম-গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া অনুতাপিত হৃদয়ে পরম পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হই, সেই রূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার অপার করুণা ও পূর্ণ-প্রীতির সমা-গমে পাপ তাপ বিমুক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও অপরিসীম আনন্দ উপভোগ ক-রিতে থাকি। পিতাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া পূর্ণ-প্রীতি সহকারে তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করত সিদ্ধকাম হই এবং আর যেন তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়, যেন সংসারের কোন প্রকার প্রলোভনে আমাদিগের হৃদ-য়ের পরম ধন হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশ্বাস রূপ কবচ দ্বারা আত্মাকে দৃঢ় বদ্ধ করি এবং স্বর্গীয় পূর্ণ প্রীতি ও বিশ্ববিজয়ী বিশ্বাসের দ্বারা আত্মাকে উন্নত ও ভক্তি-রস-পূর্ণ করিয়া অবিচলিত চিত্তে, অপরাজিত হৃদয়ে, ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট পথের পথিক হই।

অদ্যকার এই মহোৎসবের ফল এ প্রকার পূর্ণ; ইহার উদ্দেশ্য এবম্বিধ মহান্। ইহা জাতি বিশেষে আবদ্ধ বা ব্যক্তি সাপেক্ষ নহে। যেমন ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ ঈশ্বর-প্রেমে হৃদয় মনকে পরিপূর্ণ করত সেই পরম পিতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যেমন পরব্রহ্মের উপাসনায় হৃদয় মন ও আত্মাকে নিয়োগ করিয়া জীবনের সাফল্য লাভ করিতেছেন এবং পবিত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া চিত্তকে পুলকিত করিতেছেন, ব্রাহ্ম-ভগিনীগণও সেই রূপ ঈশ্বর-কাম হইয়া প্রীতি পূর্ণ হৃদয়ে এই মহোৎসবে যোগ দিয়া করুণাময় পিতার পরম মঙ্গল-স্বরূপ চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও তাঁহার প্রশস্ত পূর্ণ শান্তি ও পবিত্র আনন্দ উপভোগে বীত-শোক হইয়া ঈশ্বরের অপার মহিমা ও অপরিসীম করুণার সাক্ষ্য প্রদান করিতে-ছেন। যেমন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণাবধি সেই পবিত্র ধর্ম্ম যত্ন সহকারে রক্ষার ও তাহা দেশ বি-দেশে প্রচারের ভার প্রত্যেক ব্রাহ্মের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই রূপ করুণাময়ের করুণা প্রভাবে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বদ্ধ-মূল করার ও তাহার উন্নতি সাধনের গুরুতর ভার ব্রাহ্মিকাদিগেরই হস্তে অর্পিত হইয়াছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বর নারী-হৃদয়কে পবিত্রতার উৎস, ঈশ্বর-প্রেমের আধার, নিরুপম শান্তির আকর এবং অচলা ভক্তির জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিয়াছেন। সুকুমার নারী-হৃদয়ে স্বর্গীয় বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমুল যে প্রবল বাত্যা বা ঝঞ্ঝাবায়ু যতই বল প্র-কাশ করুক না কেন তাহাকে কোন মতেই শিথিল করিতে সমর্থ হইবে না।

বিশেষতঃ মাতাই শিশু সন্তানের মনে ধর্ম্মের বীজ সর্ব্বাগ্রে বপন করেন; মাতৃ স্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে শিশু ঈশ্বরের ভাব, ধর্ম্মের আদর্শ প্রাপ্ত হয় এবং শিশু-হৃদয়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহা অনায়াসে দূরীকৃত হয় না। ইহাতে বঙ্গ-সন্তানগণ প্রথমাবধিই যদি মাতার নিকট হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে দীক্ষিত না হইয়া অন্য কোন প্রকারের শিক্ষা পাইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে যে পরে সহজে ব্রহ্ম পরায়ণ হইবে, ইহা কোন মতেই প্রত্যাশা করা যাইতে পরে না। কা-

যেই যে পর্য্যন্ত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মিকাগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল না হইবে; যে পর্য্যন্ত বঙ্গ মহিলাগণ এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক না হইবেন এবং এক মাত্র পরমেশ্বরে হৃদয় মন সমুদায় অর্পণ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্ম হইতে পারে কিন্তু বঙ্গদেশের ধর্ম্ম হইবে না। ভারতবর্ষে পৌরাণিক ধর্ম্ম যে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে সে কি জন্য? কেবল এই নিমিত্ত যে ভারত মহিলার হৃদয় হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রগাঢ় ভাব এপর্য্যন্ত তিরোহিত হয় নাই। অন্যান্য দেশে চির প্রথানুগত জাতীয় ধর্ম্মের অলীকতা অনুভূত হইলেও সেই সমস্ত প্রদেশে সেই সমস্ত ধর্ম্মের অদ্যাপি যে প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে সে কিসের নিমিত্ত? তাহার প্রধান কারণ এই যে ঐ সমস্ত খণ্ডের নারী হৃদয়ে সেই সমস্ত ধর্ম্মের এখনও সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে; নারী হৃদয় হইতে তাহার প্রাদুর্ভাব এপর্য্যন্ত বিচ্যুত হয় নাই। এই জন্যই ব্রাহ্মিকাগণের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় ভাব বিশেষ রূপে নিহিত থাকা আবশ্যক; এই নিমিত্তই বঙ্গ মহিলাগণের আত্মাতে ঈশ্বর জ্যোতির উদ্দীপন করা এবং তাঁহাদিগের হৃদয়ে এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর পূজার মন্দির সংস্থাপন করা এবং প্রকৃত রূপে তাঁহাদিগকে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী করা ব্রাহ্ম মাত্রেরই শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যতা সাধনেরও উপায় আমরা অদ্যকার মহোৎসবে প্রাপ্ত হইতেছি। পরম পিতার সন্ততিগণ অদ্য ঈশ্বর ভাবে আত্মাকে পরিপূরিত করিয়া যে অপার আনন্দ, বিশুদ্ধ শান্তি ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতি উপভোগ করিবেন, তাহাতে তাঁহারা যে আর কখন সেই করুণাময়কে ভুলিতে পারিবেন না; কখন যে সেই আনন্দের আকরকে পরিত্যাগ করিবেন না তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! অদ্যকার এই মহোৎসবে আমাদিগের আশা এ প্রকার উন্নত হইতেছে; আমাদিগের চিন্তা এবম্প্রকার গাম্ভীর্য্যের ভাব ধারণ করিতেছে; আত্মা প্রীতিপূর্ণ হইয়া প্রীতির আকর, আনন্দের উৎস সেই পরমাত্মার সহযোগী হইয়েছে। এ প্রকার উন্নতি লাভ করিয়া—আত্মাকে প্রীতি ও পবিত্রতাতে পরিপূর্ণ করিয়াও যদি আমরা আত্মাকে এই স্বর্গীয় ভাবে চির দিন পূর্ণ রাখিতে না পারি; যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করত পরব্রহ্মের দাস হইয়া ক্ষণকাল বিলম্বে আত্মার অন্তরালোক পবিত্র ব্রহ্ম জ্যোতিকে ম্রিয়মান হইতে দিই; যদি আমাদিগের কার্য্যের দ্বারা আমরা ব্রাহ্মনামের অযোগ্য হই, যদি আমাদিগের আন্তরিক দুর্ব্বলতা বা হীন চিন্তার জন্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কলঙ্কস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শোকের ও আত্মগ্লানির আর পরিসীমা থাকিবে না। কিন্তু যদি আমরা মলিন পঙ্কিল চিন্তা সকল আত্মা হইতে দূর করিয়া, অদ্যকার উৎসবলব্ধ উৎসাহ ও আনন্দকে যত্নের সহিত সর্ব্বদা আত্মাতে রক্ষা করি; যদি প্রীতি ও বিশ্বাসকে আত্মাতে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত রাখিয়া ঈশ্বর প্রসাদে ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করি; যে পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে দিব্য ধামবাসী দেবগণ অহোরাত্র স্বর্গীয় ভাবে উন্নত রহিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত রাখি এবং কোন সময় নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া কেবল ঈশ্বর প্রেমে সর্ব্বদা হৃদয়কে পূর্ণ রাখি এবং সকল কালে সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে রত থাকি, তাহা হইলেই আমরা অদ্যকার এই মহোৎসবের প্রকৃত ফল-ভোগী হইতে পারিব। অতএব ব্রাহ্মগণ প্রাণ মন ও সমুদায় আত্মার সহিত এক বার ঈশ্বরের পবিত্র প্রীতি ও পরম মঙ্গল

স্বরূপকে হৃদয়ে ধারণ করুন, বিশ্ব নিয়ন্তার বিশুদ্ধ প্রেম-রসে হৃদয়কে আর্দ্র করত সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত করুণাময়ের অপার করুণা উপভোগের নিমিত্ত সচেষ্ট হউন, এবং যে পবিত্র ধামে রোগ নাই শোক নাই, যেখানে পাপ বা দুশ্চিন্তা কখন স্থান পায় না, যেখানে পরম পিতার অজস্র করুণা নিরন্তর সকল স্থানে সমান ভাবে বিরাজ করিতেছে; যেখানে আত্মা বিশুদ্ধ পবিত্র ব্রহ্মালোকে সর্ব্বক্ষণ প্রদীপ্ত ও পরমানন্দে পুলকিত থাকে এবং যে আনন্দ ধামের কিঞ্চিৎ আভাষ আমরা অদ্যকার মহোৎসবে প্রাপ্ত হইতেছি, সেই পবিত্র ধামের নিমিত্ত যাহাতে আমরা প্রস্তুত হইতে পারি এবং আমাদিগের কার্য্যের দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্রতা বা উদারতার লাঘব না হয় এবং যাহাতে সকল দেশের সর্ব্ব প্রকার লোকে ইহার সুশীতল ছায়ায় শান্তি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য যত্নশীল হউন। ঈশ্বর আমাদিগের এক মাত্র নেতা ও মঙ্গল বিধাতা, এই সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস সংস্থাপন করত ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করুন এবং দুশ্চিন্তা ও পাপ লালসা পরিত্যাগ করিয়া অনুকরণোপযোগী সাধু-চারিতার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্থির ভাবে, অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

মানব-আত্মা এই জড় শরীর অবলম্বন করিয়া এই জড় রাজ্যেই ভূমিষ্ঠ হয়। মনুষ্যের নবোন্মীলিত নেত্র-যুগল সর্ব্ব প্রথমেই জড় বস্তু সন্দর্শন করে। যে পরিমাণে তাহার শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই তাহার জড় বস্তুর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্টতা হইতে আরম্ভ হয়। শিশু যখন গৃহ প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তখন সুচিত্র গৃহ উপকরণ সকলই তাহার চিত্ত বিনোদন করে। গৃহ প্রাঙ্গনে আনয়ন করিলে আকাশের শোভাময় চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সুরঞ্জিত মেঘ-মালাই তাহার নয়ন-মনকে আকর্ষণ করিতে থাকে। উদ্যান কাননে লইয়া গেলে সহস্রবিধ প্রাণদ ওষধি বনস্পতির মধ্যে—যাহার পত্র পুষ্প বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, যাহার ফল বিচিত্র সৌন্দর্য্যে শোভিত, তাহার প্রতিই তাহার চক্ষু নিপতিত হয়, তাহাই গ্রহণ করিবার জন্য সে ব্যাকুলতার সহিত হস্ত প্রসারণ করে। শোভাময় পত্র পুষ্প, সুচিত্র দ্রব্য সামগ্রী তাহার প্রার্থনীয়, তৎসমূহ লইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করাই তাহার প্রাণগত ইচ্ছা। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মনুষ্য দেশ-ভেদে কাল-ভেদে জগদীশ্বরের জড় উদ্ভিদ্ ও প্রাণি রাজ্যে কত শোভা-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া থাকে, বিদ্যালয়ে গমন করিয়া কত পদার্থেরই পরিচয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্য কি এই সুবিশাল সংসার-ক্ষেত্রে কেবল পদার্থ জ্ঞান লাভ করিতেই আগমন করিয়াছে? সে কি কেবল বাহ্য বস্তুর শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতেই এখানে অবতীর্ণ হইয়াছে? সে কি কেবল আপনার জড় শরীরের অভাব সকল জড়-রাজ্য হইতেই পূরণ করিবার জন্য এই পৃথ্বী তলে ভ্রমণ করিতেছে? যে আত্মা থাকাতে মনুষ্য এই ভূমণ্ডলে সর্ব্ব-প্রাণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই আত্মা কি এখানে উপবাসী থাকিবে? তাহার ভরণ পোষণের জন্য—তাহার সম্ভোগের নিমিত্ত কি এখানে কিছুই নাই? আত্মারই জন্য সকলই। আত্মার শিক্ষা সাধন নিমিত্ত এই বিশাল বিশ্ব-বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। আত্মারই ব্রহ্মজ্ঞান,

ঈশ্বর-প্রীতি উদ্দীপনের জন্য করুণা-নিধান চতুর্দ্দিকে বিচিত্র রচনা বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন—অনুপম সৌন্দর্য্য-জালে জগন্মণ্ডল মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন যে, সে এই শোভার মধ্যে শোভার আকরকে অন্বেষণ করিবে—কৌশলের মধ্যে কৌশল-কর্ত্তার তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে। এখানকার অন্নপানে শরীরকে পোষণ করিয়া—এখানকার সুখ-শান্তিতে হৃদয়-মনকে স্নিগ্ধ রাখিয়া সেই অন্ন দাতা পিতা, শান্তি-দাতা বিধাতার প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকিতে শিক্ষা করিবে, ইহারই জন্য এই বিচিত্র বিশ্বের রচনা। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি জড় বস্তুর সঙ্গে লোকের এমনি ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যে জড়ের অতীত বস্তুর সত্তা সহসা উপলব্ধি করিতে পারে না। মনুষ্যের হস্ত পদাদি তো জড়-রাজ্যের—ভৌতিক-রাজ্যের মধ্যে চালিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তি সকলও এমনই বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে, যে তাহার আত্ম দৃষ্টি, আত্ম চিন্তার ভাব উদয়ই হয় না—আত্মার পরিপোষণের প্রতি তাহার দৃষ্টিই থাকে না। এই সমস্ত জড় আবরণের মধ্যে "প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি" যিনি প্রাণ-রূপে সকলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি সকলের দৃষ্টি নিপতিত হয় না। "সর্ব্বএত আত্মানং সমর্পিতাঃ" "এই সমুদায়ই যে পরমাত্মাতে সমর্পিত হইয়া রহিয়াছে" তাঁহাকে দেখিতেও পায় না। আত্মার ভোগ্য বস্তু, আত্মার অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান থাকিলেও সে সেই আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহা ভোগ করিতে না পারিয়াই এখানে জীর্ণ-শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া থাকে। তাহার প্রকৃত স্ফূর্ত্তি-উদ্যম দৃষ্ট হয় না। সে সেই অমৃতের সোপান দেখিতে না পাইয়া মৃত্যুর রূপ জড়ের মধ্যেই মুহ্যমান হইয়া অবস্থান করে। প্রকৃত রূপে আত্মা বল-লাভ, পুষ্টি-লাভ ও উন্নতি-লাভ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই সেই অজ-ভূমা পরমেশ্বরই যে তাহার উপাস্য দেবতা—সেই বিষয়াতীত মহান্ আত্মাই যে তাহার সর্ব্বস্ব, সে তাহা সকল অবস্থাতে স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত যোগ-নিবদ্ধ করিতে পারে না। অনেকেই দুর্ব্বলতা নিবন্ধন বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্ম-চিন্তা, ব্রহ্ম-সাধন মনুষ্যের অসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু আত্মা যদি পরমাত্মার সত্তা উপলব্ধি করিতে না পারে—জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত উন্নতিশীল অমর আত্মা যদি পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, অমৃত-স্বরূপ পরমেশ্বরের সন্নিকর্ষ-লাভে সমর্থ না হয়, তবে কি জড় উদ্ভিদ্ সকল—না ইতর-প্রাণী-পুঞ্জ ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিবে? আত্মা যদি দ্যুলোক, ভূলোক, জড় উদ্ভিদ্ প্রাণিগণের মধ্যে শোভা সৌন্দর্য্য, কৌশল-কলাপ সন্দর্শনে অশক্ত হয়, তবে আর এই মর্ত্ত্য-লোকে দ্রষ্টা, মন্তা, ভোক্তা কোথায়? জ্ঞান-প্রেম সমন্বিত আত্মা যদি এই আনন্দ কাননে জ্ঞানময় আনন্দময়ের আবির্ভাবের মধ্যে যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ভোগ করিয়া উচ্চরবে ব্রহ্ম-যশ গান না করে, তবে আর এই প্রাকৃতিক উৎসব-ক্ষেত্রের গায়ক কোথায়? তবে এই আনন্দ-কানন আর কাহার জন্য? এই বিশ্ব-সংসার অহর্নিশি যে মহান্ বল মহীয়সী শক্তি অনুপম জ্ঞান প্রেমের পরিচয় প্রদান করিতেছে, আত্মা যদি তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে, তবে আর এখানে বোদ্ধা কে? আত্মার শিক্ষা সাধনের জন্যই এই সংসার, কেবল আত্মারই ভোগের জন্য এই বিশ্বের স্রষ্টা-পাতা-পরমাত্মা অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত-ভাবে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন।

প্রকৃতি-পুস্তক পাঠ না করিলে তো সংসারে আমাদের একটি অভাবও বিদূরিত হয়

না। এমন কি প্রাকৃতিক তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে, স্থপতির গৃহ নির্ম্মাণে, কাণ্ডারীর পোত-সঞ্চালনে, কৃষির ফল-শস্য উৎপাদনে, শিল্পীর কারুকার্য্য সাধনেও সমর্থ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই অশেষ জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিতে না পারিলে তো বিদ্যা বিত্তের উন্নতি নিবন্ধন শারীরিক ও মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হইবার উপায়ন্তর নাই। কিন্তু তাহাই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে। বিশ্ব কার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা আত্মার পরম অন্ন পরমেশ্বরকে লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং শরীর মন আত্মা সকলেরই উন্নতি সাধন জন্য মনুষ্যকে বিশ্ব-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হয় সত্য বটে কিন্তু যেরূপে এই বিশ্ব-বেদান্ত অধ্যয়ন করা উচিত, তাহার ব্যতিক্রম বশতই মনুষ্যের সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ—ব্রহ্মলাভ হয় না। জগন্মন্দিরের কেবল দ্বার দেশে উপনীত হইলে, কেবল বাহ্য-শোভা সন্দর্শন করিলে কি হইবে? কেবল রচনা কৌশল নিরীক্ষণ করিয়া সাধারণ নিয়ম-তত্ত্ব অবগত হইলে কি অধিক ফল লাভ হইবে? নিয়ন্তাকে দেখাই আত্মার লক্ষ্য। কেবল উদ্ভিদ্ প্রাণি শরীরে কৌশল-কলাপ অবলোকন করিয়া চমৎকৃত হইলে মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হয় না, কৌশল কর্ত্তাকে জানাই প্রার্থনীয়। কেবল চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ অগ্নির অতুল প্রতাপ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলে কি হইবে? "যো দেবোগ্নৌ" যে দেবতা অগ্নিতে, তাঁহাকে দেখাই আবশ্যক। কেবল নদ-নদী, সিন্ধু সরোবরের গভীরতা নির্ণয় করিতে পারিলে কি হইবে? "যোঽপ্সু" যিনি জলেতে, তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করাই বিশেষ প্রয়োজন। প্রাণদ ওষধি কুলের গুণ ও প্রকৃতি অবগত হইয়া তাহারদিগের শ্রেণী নির্ণয় করিতে পারিলে জ্ঞান বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় না, "য ওষধিষু" যিনি ওষধিতে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হয়। কেবল বিচিত্র বনস্পতি-বর্গের গুণ গৌরব, জাতি স্বভাব নির্দ্দেশ করিতে পারিলে চরম-জ্ঞান লাভ হয় না "যো বনস্পতিষু" যিনি বনস্পতিতে, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জ্ঞান তৃপ্ত হয়। কেবল দ্যুলোক ভূলোকের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলেই পুরুষত্ব প্রকাশ পায় না। "যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ" যিনি বিশ্ব-সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, তিনি জ্ঞান চক্ষের প্রত্যক্ষ হইলেই অমরত্ব লাভ হয়। "বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতাভবন্তি" "সেই বিশ্ব-সংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিতা পরমেশ্বরকে জানিয়া লোক সকল অমর হয়েন।

অতএব আমারদের চক্ষু যেন কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট না থাকে। আমরা যেন কেবল বালকের ন্যায় বাহ্য-উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত না থাকি। আত্ম-পোষণ আত্মোন্নতি সাধানই যেন আমারদের নিত্য-কর্ম্ম হয়। জগতের এই বিচিত্র রচনার মধ্যে বিশ্ব-রচয়িতা পরমেশ্বরকে যাহাতে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই, প্রত্যেক ঘটনায়—প্রতি কৌশলে যাহাতে সেই মঙ্গলময়ের জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের উজ্জ্বল সত্তা সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারি, আত্মার নিভৃত-নিলয়ে যাহাতে সেই আত্মার অন্তরাত্মাকে দেদীপ্যমান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত যুক্তমনা যুক্ত-আত্মা হইয়া থাকিতে পারি, এই অভিলাষই যেন হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। ইহাতেই মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ হয়, ইহাতেই মানব-আত্মা মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াও দেবত্ব লাভ করে এবং ইহাতেই আত্মার সুখ-শান্তি, স্বর্গ মুক্তি সকলই।

হে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর! আমাদের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ কর। আমরা এখানে আর কিছুরই প্রার্থী হইয়া আসি নাই, কেবল তোমার দর্শন-লাভের নিমিত্ত তৃষিত—ব্যাকুলিত হইয়া তোমাকেই ডাকিতেছি, তুমি আমারদের অন্তরতম কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা।

অদ্য আমাদিগের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস। অদ্যকার উৎসব কোন্ দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে? এই বৃক্ষ লতা পুষ্প শোভিত প্রশস্ত প্রাঙ্গন—এই সমুজ্জ্বল দীপ মালা—গীত বাদ্যের মহা আয়োজন, মহা মহোৎসবের এই সকল চিহ্ন কোন্ দেবতার উদ্দেশে প্রদর্শিত হইতেছে? যাঁহার উদ্দেশে অদ্যকার উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, যিনি অদ্যকার বিশাল ব্রহ্ম-যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি অদৃশ্য। যখন সেই অদৃশ্যের সহিত দৃশ্যমানের সম্বন্ধ আলোচনা করি, তখন আমার মন বিস্ময় রসে প্লাবিত হয়। যে পদার্থকে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, তাঁহার জন্য আত্মা কেন এত ব্যগ্র হয়? ইহার একমাত্র কারণ এই যে ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, সে সম্বন্ধকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ঘোর বিষয়ীর মনেও তিনি কখন কখন "চঞ্চলা চপলা সমান", প্রকাশিত হয়েন, ঘোর নাস্তিকও আকস্মিক বিপৎপাত সময়ে অদৃশ্যের পরাক্রম দ্বারা অভিভূত হইয়া তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না। ঈশ্বর আপনি প্রশান্ত ভাবে অবস্থিতি করিয়া, সমস্ত জগৎকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। কত লোকে ঈশ্বর উদ্দেশে প্রচণ্ড আতপ তাপে ক্লিষ্ট হইয়া দুরন্ত তীর্থ পর্য্যটন কার্য্য সমাধা করে; ঈশ্বরের উদ্দেশে কত লোক আপনার শরীরকে দারুণ যাতনা প্রদান করে; ঈশ্বরোদ্দেশে কত লোক সকল অপেক্ষা দুস্ত্যজ্য স্ত্রী জাতির সহিত সহবাস পরিত্যাগ করে; কত লোকে ঈশ্বরোদ্দেশে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করে। ঈশ্বরের প্রতি মানব কুলের এপ্রকার প্রগাঢ় অনুরাগের কারণ কি? এই প্রশ্নের এই মাত্র উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে অনুরাগের কারণ অনুরাগ। ঈশ্বরকে মনুষ্য দেখিতে পায় না অথচ তাঁহার জন্য লালায়িত হয়। উষ্ট্র যেমন দুরস্থিত জলাশয় চক্ষে না দেখিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়াও তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। যে দেশে বসন্ত সমাগম হইয়াছে সে দেশ চক্ষে না দেখিয়া বসন্তানুরাগী পক্ষী যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে চক্ষে না দেখিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়। নবজাত মধুমক্ষিকা মধু কি পদার্থ তাহা বিজ্ঞাত না হইয়াও যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হয়, সেই রূপ মনুষ্য ঈশ্বরকে বিজ্ঞাত না হইয়াও তাঁহার প্রতি ধাবিত হয়।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদিগের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ঠিক নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। ঈশ্বরকে আমরা আমাদিগের পিতা মাতা ও প্রেমাস্পদ বলিয়া থাকি কিন্তু তিনি কি ঠিক মর্ত্তালোকের পিতা মাতা অথবা প্রেমাস্পদের ন্যায়? কখনই নহে। তাঁহার সহিত আমাদিগের ঠিক কি সম্বন্ধ তাহা জানি না; কেবল আমরা এই মাত্র জানি যে তিনি আমাদিগের আপনার বস্তু, এমন কি, তিনি আপনা হইতেও আপনার।

"ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে।
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে॥

তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
প্রিয়বন্ধু বা কি পুত্র কন্যে,
এ নয় তোমাতে সম্ভব, একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।
সকল শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই, তোমার সনে।
তুমি হবে কেউ আমার,আপনা হতে আপ-
নার, আপনা হতে নইলে মন কি টানে"?

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে আপনা হইতে আ-পনার বলিয়া জানিয়াছেন, যিনি ঈশ্বরের আকর্ষণ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি একাকাঙ্ক্ষী হয়েন। তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু চাহেন না; তিনি বন্ধুর নিকট হইতে বন্ধুতা ব্যতীত আর কিছু প্রার্থনা করেন না। যদ্যপি তিনি ধন লাভের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে না পারেন তবে তিনি তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েন না,কারণ তিনি একাকাঙ্ক্ষী। যদ্যপি তিনি মান লাভের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে না পারেন তবে তিনি তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েন না কারণ তিনি একাকাঙ্ক্ষী। যদ্যপি তিনি যশ লাভের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে না পারেন তিনি তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয়েন না কারণ তিনি একাকাঙ্ক্ষী। যদ্যপি সম্পদ রূপ শোভন প্রশস্ত প্রাঙ্গন তাঁহার না থাকে, সন্তোষ রূপ কোন্ ত তাঁহার আছে? যদ্যপি তিনি লোকের নিকট মান প্রাপ্ত না হয়েন, ধর্ম্মের নিকট ত মান প্রাপ্ত হয়েন? যদ্যপি তিনি লোকের নিকট যশ প্রাপ্ত না হয়েন, আত্ম প্রসাদ ত সুমধুর স্বরে তাঁহার কার্য্যের অনুমোদন করিতেছে? এ-কাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির মতি গতি ঈশ্বরে; ঈশ্বরই তাঁহার আবাস স্থান, ঈশ্বরই তাঁহার সম্পদ, ঈশ্বরই তাঁহার আনন্দ। তিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, তিনি পরমাত্মাতে রমণ করেন। তিনি যে প্রকার আনন্দ সর্ব্বদা উপভোগ করেন, তাহা বাক্যেতে বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার মনে অদ্যকার মহা মহোৎসবের ভাব নিরন্তর বিরাজিত থাকে। তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গে, উৎসব হইতে উৎসবে আরোহণ করেন।

যে ব্যক্তি বহ্বাকাঙ্ক্ষী তাঁহার দুঃখের অবধি নাই। তিনি কোন বিষয়ে তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। যে ব্যক্তি শত মুদ্রা লাভ করেন, তিনি সহস্র মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা করেন, যে ব্যক্তি সহস্র মুদ্রা লাভ করেন, তিনি লক্ষ মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা করেন; যিনি লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন, তিনি কোটি মুদ্রার আকাঙ্ক্ষা করেন। যিনি "কতিপয় গ্রামেশ", তিনি দেশের রাজা হইতে বাসনা করেন; যিনি এক দেশ মাত্রের রাজা, তিনি সম্রাট হইতে বাসনা করেন; যিনি সম্রাট্,তিনি পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে বাসনা করেন, এই রূপে আশার আর অবধি নাই, অতএব বহ্বাকাঙ্ক্ষী কখনই তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন না। এতদ্ব্যতীত কোন একটি পার্থিব কামনা পরিপূরণের প্রতি শত সহস্র বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং তিনি তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হয়েন কিন্তু যিনি একা-কাঙ্ক্ষী তিনি এরূপ ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়েন না; তাঁহার আনন্দ অনায়াসলভ্য। তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেই হৃদয় ধামে তাঁহার প্রেমাস্পদকে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

আমাদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে বহুর মধ্যে আমাদিগের আত্মা যেন হারাইয়া না যায়। বহুরূপ সমুদ্রের উপর আত্মা রূপ তরণী ভাসমান থাকিবে কিন্তু তাহাতে নিমগ্ন হওয়া উচিত নহে। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়ে আমাদিগের চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত রাখা কর্ত্তব্য। যেমন কোন স্ত্রীলোক তন্তু-বয়ন কার্য্য সময়ে গান করে কিন্তু গান করিতে করিতে বয়ন কার্য্য বিস্মৃত হয় না, সেই রূপ ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি

সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়েও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন না; তিনি তাঁহাকে সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখেন, অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করেন। যেমন দিগ্‌দর্শনের শলাকা অন্য দিকে সর্ব্বদা হেলে দোলে তথাপি উত্তর দিকেরই প্রতি লক্ষিত থাকে, সেই রূপ একাকাঙ্ক্ষীর আত্মা সংসারের দিকে হেলে দোলে কিন্তু ঈশ্বর রূপ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হয় না। তিনি নিষ্কাম হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশে সাংসরিক কার্য্য সকল সম্পাদন করেন।

হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা সর্ব্বদা এই বিষয় লইয়া আন্দোলন কর যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কিসে উন্নত হইবে? এ কথার মীমাংশা এক কথায়। সে কথা "ব্রহ্ম প্রীতি"। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যদাপি পাপাসক্ত হই, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কখন উন্নতি হইতে পারে না। পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? পাপ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ঈশ্বর-প্রীতি। পাপের প্রতি আমরা কেন আসক্ত হই? তাহার কারণ এই যে পাপের প্রতি আমারদিগের প্রীতি আছে। পাপ হইতে প্রীতি বল-পূর্ব্বক উঠাইয়া যদি ঈশ্বরে তাহা লইয়া ফেলিতে পারি তবেই পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, নতুবা তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কেবল ঈশ্বর প্রেমাগ্নিই পাপকে ভস্মীভূত করিতে পারে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশিষ্ট উপায় কি? ব্রহ্ম-প্রীতি। ব্রহ্ম প্রীতি শরীরকে সবল করে, মনকে সতেজ করে, অগ্নিময় বাক্য সকল মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইতে থাকে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের উপায় কি? ব্রহ্ম প্রীতিই তাহার একমাত্র উপায়। যদি ব্রহ্ম প্রীতি দ্বারা মন আর্দ্র থাকে, তবে ব্রাহ্ম ভ্রাতা দূরে থাকুন, দূরসম্বন্ধ ব্যক্তির প্রতিও মন প্রীতি-রসে বিগলিত হয়।

হে পরমাত্মন্! হে পতিত পাবন পরমেশ্বর! হে দীনবন্ধু! তোমার দীন হীন সন্তানদিগকে তোমার দিকে লইয়া যাও। তাহাদিগের সকল বাসনা, সকল কামনা তোমাতে একত্রীভূত কর; তাহাদিগকে একাকাঙ্ক্ষী কর। যাঁহারা অদ্য উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের সকলকে তোমার পবিত্র ধর্ম্ম পথের পথিক কর। যে সকল ব্রাহ্ম এই স্থানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা যাহাতে সকলে সম্মিলিত ভাবে তোমার মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে পারেন এবং তোমার কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারেন এমন ধর্ম্মবল তাঁহাদিগকে প্রদান কর। যে সকল নরনারী শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদিগকে তোমার মঙ্গলচ্ছায়া প্রদান কর। এই পবিত্র গৃহবাসীদিগকে সকল প্রকার ঐহিক ও পারত্রিক সুখ প্রদান কর। সমস্ত বঙ্গদেশকে আশীর্ব্বাদ কর। দুঃখভারপ্রপীড়িত বঙ্গদেশ কেবল তোমার মুখের পানে চাহিয়া একটু শান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতেছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নূতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

রাগিনী পঞ্চম বাহার—তাল ধামাল।

প্রথম সমাজে আজু মহোৎসব, গাও সবে সুমধুর তানে।

হৃদি হৃদি বিকশিত কুসুম মঞ্জরী উপহর প্রেম-নিধানে।

লাভ কর রে চির জীবন সম্পদ ব্রহ্মামৃতরস পানে।

সন্তাপ-হরণ আনন্দ-মুখচ্ছবি মধু বরষে মম প্রাণে।

রাগ ভৈরব—তাল সুরফাকতাল।

সব দুঃখ দুর হইল তোমারে দেখি;

একি অপার করুণা তব, প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়।

সব দেখি শূন্যময়, না যদি তোমারে পাই, চন্দ্র সূর্য্য তারক জ্যোতি হারায়।

প্রাণ-সখা তোমা সম আর কেহ নাহি, প্রেমসিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায়।

থাক সঙ্গে অহরহ, জীবন কর সনাথ, রাখ প্রভু জনম জনম পদ ছায়ে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

অকূল ভব সাগরে তারহে তারহে, চরণ-তরি দেহি অনাথ নাথ হে।

সন্তাপ নিবারণ, দুর্গতি বিনাশন, দুর্দিন তিমির হর, পাপ তাপ না সহে।

সায়ংকাল।

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে, তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে।

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।

কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।

রাগিণী গারা—তাল কাওয়ালি।

কি মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর তব করুণা।

তব করুণা সব জগতময়, সকলে গায় তোমারি প্রভু করুণা,

গায় তরুণ অরুণ, শশি, নদী গিরি ফুল বন; যথায় তথায় তব জয় জয় রব,

গায় নর নারী অগণন, কেহ নহে নীরব।

এই ঘোর সংসার করহে পার, কর্ণধার ভব জলধি মাঝে;

হৃদয়ের ধন তুমি, নিয়ত মম হৃদে বিরাজো, কি আর কব।

রাগ দেশ—তাল কাওয়ালি।

পরমেশ্বর একতুহি ভজরে প্রাণ, আওর কহাঁভি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।

শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হমারা

এক ব্রহ্মকো হৃদে রাখোরে ধ্যান।

রাগিণী নারায়ণী—তাল জৎ।

ভজোরে ভজরে ভব-খণ্ডনে, ভজোরে বিশ্ব-জন-বন্দনে।

জগত-রঞ্জন ভকত-চিত্ত বিনোদনে, মোদনে, পালনে, তারণে, প্রণত-জন-সৌভাগ্য-জননে।

শুদ্ধ সত্য জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তি-দাতা জগত-প্রাণে।

অন্তর যামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে।

পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত পাতক নাশনে।

সর্ব্ব লোকাশ্রয় প্রভবে, সত্যাত্মনে, প্রেমাত্মনে।

রাগিণী রাজবিজয়ী—তাল সুরফাকতাল।

নিখিল-ভুবন-পতি, পরম-গতি ব্রহ্ম, ভূমা, শাশ্বত মহিমা।

কোটি কোটি রবি চন্দ্র তারা, তব প্রতাপে ভ্রাম্যমানা।

পরম দেব, সুন্দর শোভন, জগজন-চিত চকোর লোভন।

আনন্দাগার সকল সংসার তব উদার প্রেমে, কোথায় সে প্রেমের সীমা।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

এক প্রথম জ্যোতি, অতি শুভ্র, পরম, ব্রহ্ম, প্রভু, সর্ব্বলোক সেতু, পরমেশ্বর।

রাজ-রাজ বিশ্বরাজ, আদি কোথায়, অন্ত কোথায়, বিশ্বম্ভর।

মহা ব্যোমে তোমারি শাসনে ধাইছে তারা রবি শশি, ধায় সসাগর মহী—সুমহত যশ ঘোষে।

ভূলোক দ্যুলোক তোমারি রাজ্য, অতুলন তব ঐশ্বর্য্য,

তুমি মহান তুমি পুরাণ, দীন শরণ মঙ্গলময়।

রাগিনী বেহাগ—তাল চৌতাল।

ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর, হৃদয় নাথ, হৃদয়ে দেখা দেও হে।

আঁধার হৃদয় আলো কর মোচন কর পাপ ভার, নিত্য নিয়ত হৃদে বিহার, দীনে শরণ দাও হে।

যবে পাই তোমা ধনে, সকলি নিরখি সুধাময়, জ্যোতির্ম্ময়, শোভাময়,

পাইলে তোমায় মৃত শরীর প্রাণ পায় কোটি কোটি স্বরগ প্রকাশ পায়, দুখ তাপ না রহে।

উপনয়ন সংস্কার।

কি অধ্যাপক, কি বিদ্যার্থী, কি বিষয়ী, সকলেই সামান্যত যজ্ঞোপবীত গ্রহণের নাম উপনয়ন সংস্কার বলিয়া থাকেন, কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে উপনয়ন বলে, কেহই তাহা বিশেষ রূপে অনুধাবন করিয়া দেখেন না, অতএব উপনয়নের যথার্থ অর্থ কি এবং তাহার উদ্দেশ্যই বা কি, সম্প্রতি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমত তাহার লক্ষণ নিরূপণ করিতেছি। উপনয়নের লক্ষণ স্মৃতিকার রঘুনন্দন লিখিয়াছেন, যথা—

অধ্যাপনার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন
কর্ম্মণা তদুপনয়নমিতি। গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা
যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ। বালো বেদায়
তদ্যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুরিতি স্মৃতেঃ।

সংস্কারতত্ত্ব ৫৩১ পৃ।

যে কর্ম্ম দ্বারা অধ্যয়নের নিমিত্তে আচার্য্য সমীপে নীত হয়, তাহার নাম উপনয়ন। যেহেতু স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, গৃহ্য সূত্রোক্ত যে কর্ম্ম দ্বারা বেদাধ্যয়নার্থ বালক গুরু সমীপে নীত হয়, এই ব্যুৎপত্তি যোগে, সেই কর্ম্ম বালকের উপনয়ন বলিয়া জানিবে।

কোন্ কর্ম্ম দ্বারা বেদাধ্যয়নের নিমিত্তে বালক আচার্য্য সমীপে নীত হয়, এক্ষণে তাহার স্বরূপ ও তাৎপর্য্য নিরূপিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাঁরাই বেদাধ্যয়নে অধিকারী, সুতরাং এই তিন মাত্র বর্ণেরই শাস্ত্রে উপনয়ন সংস্কার বিহিত আছে এবং ইহাঁরদিগকেই দ্বিজ বলে। শূদ্রের বেদে অনধিকার প্রযুক্ত উপনয়ন সংস্কার নাই, সুতরাং তাহারা দ্বিজ শব্দের বাচ্য নহে। দ্বিজ শব্দের অর্থ—যাহারা দুইবার জন্মে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের দ্বিতীয় জন্ম কিরূপে হয়, এক্ষণে তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে, কারণ উহা নির্ণীত হইলেই যে কর্ম্ম দ্বারা বালক বেদাধ্যয়নার্থ আচার্য্য সমীপে নীত হয়, তাহা নিরূপিত হইবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের কটিদেশে যে মৌঞ্জী* মেখলা বন্ধন হয়, শাস্ত্রে তাহাই ইহাঁরদিগের দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা মনু।

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ।

২ অধ্যায় ১৬৯ শ্লোক।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমত মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, মৌঞ্জী বন্ধনে ইহাঁরদিগের দ্বিতীয় জন্ম হয়, যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার নাম ইহাঁরদিগের তৃতীয় জন্ম।

তত্র যদ্ব্রহ্মজন্মাস্য মৌঞ্জীবন্ধনচিহ্নিতং।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতাত্বাচার্য্য উচ্যতে।

২ অধ্যায় ১৭০ শ্লোক।

এই জন্মত্রয়ের মধ্যে ইহাঁরদিগের মৌঞ্জী বন্ধন চিহ্নিত যে জন্ম, তাহার নাম ব্রহ্ম জন্ম, তাহাতে সাবিত্রী ইহাঁরদিগের মাতা এবং আচার্য্য ইহাঁরদিগের পিতা।

ইহাতে আভাসে এই মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল, যে উপনয়নের উদ্দেশ্য বেদ গ্রহণে অধিকার এবং গায়ত্রীই সকল বেদের সার ভাগ। কিন্তু কটিদেশে মৌঞ্জী মেখলা বন্ধন রূপ উক্ত প্রকার দ্বিতীয় জন্ম ব্যতীত সেই

---

* শরপত্র নির্ম্মিত রজ্জু।

বেদ গ্রহণে বা বৈদিক কর্ম্ম করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, যথা মনু।

বেদপ্রদানাদাচার্য্যং পিতরং পরিচক্ষতে।
ন হ্যস্মিন্ যুজ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদামৌঞ্জিবন্ধনাৎ।

২ অধ্যায় ১৭১ শ্লোক।

যেহেতু মৌঞ্জী মেখলা বন্ধনের পূর্ব্বে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে না, সেই জন্য মৌঞ্জী বন্ধন পূর্ব্বক বেদ প্রদান করাতে আচার্য্য পিতা বলিয়া উক্ত হয়েন।

নাভিব্যাহারয়েদ্ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্‌যাবদ্বেদে ন জায়তে।

২ অধ্যায় ১৭২ শ্লোক।

যাবৎ কাল বেদে জন্ম গ্রহণ না হয়, তাবৎ কাল ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শূদ্রের সমান থাকেন এবং শ্রাদ্ধীয় মন্ত্র ব্যতীত তাবৎ কোন বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে অধিকারী হয়েন না।

মেখলামাবধ্য দণ্ডং প্রদায় ব্রহ্মচর্য্যমাদিশেৎ।
আশ্বলায়নীয়গৃহ্যসূত্রে ২ অধ্যায় ২২ কণ্ডিকা ১ সূত্র।

মৌঞ্জী মেখলা বন্ধন করিয়া দণ্ড প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য উপদেশ করিবেক।

শাস্ত্রালোচনায় এই মাত্র প্রতীতি হইতেছে যে কটিদেশে মৌঞ্জী মেখলা বন্ধন করিয়া দণ্ড ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নার্থ আচার্য্য সমীপে উপনীত হইতে হয়। এতাবতা উপনয়নের মুখ্য তাৎপর্য্য এই সিদ্ধ হইল যে দণ্ড ধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বেদের উপদেশ গ্রহণ; সুতরাং মৌঞ্জী মেখলা বন্ধন রূপ দ্বিতীয় জন্ম ব্যতীত সেই উপদেশ গ্রহণে অনধিকার প্রযুক্ত মৌঞ্জী মেখলা বন্ধনের নামই উপনয়ন সংস্কার ইহা সিদ্ধ হইল।

যদিও বেদে বা গৃহ্য সূত্রে উপনয়ন কালে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিবার কথা লিখিত নাই, তথাপি স্মৃতিকার রঘুনন্দন ত্রিবৃত মৌঞ্জী মেখলা মানবকের কটিদেশে বন্ধন করিবার পর লিখিয়াছেন, যথা—

গৃহ্যানুক্তমপি যজ্ঞোপবীতমস্মিন্নেব সময়ে পরিধাপয়েৎ; মেখলান্তরং কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃদিতি মনূক্তেঃ, পবিত্রাঞ্চাস্মৈ প্রয়চ্ছতীতি জাতূকর্ণাৎ, যজ্ঞোপবীতিনং কুর্য্যাদিতি সাংখ্যায়নাচ্চ।

সংস্কার তত্ত্ব ৫৩৫ পৃ।

গৃহ্য সূত্রে উক্ত না হইলেও এই সময়ে যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেক, যেহেতু মেখলা বন্ধনের পর কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত ত্রিরাবৃত ত্রিগুণীকৃত ত্রিবৃত ব্রাহ্মণের উপবীত মনু কহিয়াছেন ও ব্রহ্মচারিকে পবিত্র দিবেক ইহা জাতূকর্ণ কহিয়াছেন এবং যজ্ঞোপবীত বিশিষ্ট করিবেক এই রূপ সাংখ্যায়ন কহিয়াছেন।

এক্ষণে যজ্ঞোপবীত ধারণের উদ্দেশ্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া উপবীতাদি বিশিষ্টের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

উপবীতীর লক্ষণ ও তৎপ্রসঙ্গে প্রাচীনাবীতীর এবং নিবিতীর লক্ষণ মনু কহিয়াছেন, যথা—

উদ্ধৃতে দক্ষিণে পানাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে প্রাচীনআবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে।

২ অধ্যায় ৬৩ শ্লোক।

দক্ষিণ কক্ষাবলম্বিত, বাম স্কন্ধে স্থিত উপবীত বিশিষ্ট দ্বিজ উপবীতী, বাম কক্ষাবলম্বিত ও দক্ষিণ স্কন্ধে স্থিত ঐরূপ বিশিষ্ট দ্বিজ প্রাচীনাবীতী এবং কণ্ঠে সুসজ্জিত ও উভয় স্কন্ধে স্থিত ঐরূপ বিশিষ্ট দ্বিজকে নিবীতী কহে।

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার সময়ে ঐরূপ উপবীত ধারণ করিতে হয় বলিয়া উহাকে যজ্ঞোপবীত ও যজ্ঞসূত্র কহে; অতএব যজ্ঞ কয় প্রকার এবং তাহারদিগের স্বরূপ কি, তাহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে। মহা যজ্ঞ পাঁচ প্রকার; ব্রহ্ম-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, দেব-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ, ও নৃ-যজ্ঞ, যথা মনু।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোতিথিপূজনং।

৩ অধ্যায় ৭০ শ্লোক।

বেদের অধ্যাপনের নাম ব্রহ্ম যজ্ঞ, পিতৃগণের তৃপ্তি সাধনের নাম পিতৃ যজ্ঞ, বৈশ্বদেব হোমের নাম দেব যজ্ঞ, বলিবৈশ্য প্রদানের নাম ভূত যজ্ঞ এবং অতিথি সেব্যকে নৃযজ্ঞ কহে।

উক্ত পাঁচ প্রকার মহা যজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্ম যজ্ঞের স্বরূপ মনু কহিয়াছেন, যথা—

অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যং সমাহিতঃ।

২ অধ্যায় ১০৪ শ্লোক।

ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করত জল সমীপে নিত্য নিয়ম করিয়া প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রীর অধ্যয়ন করিবেক, ইহা ব্রহ্ম যজ্ঞ।

পঞ্চ মহা যজ্ঞের অন্তর্গত ব্রহ্ম যজ্ঞ ভিন্ন অপর চারিটি যজ্ঞে অন্ন পাক করিতে হয় বলিয়া তাহারদিগের সাধারণ নাম পাক যজ্ঞ, তদ্ভিন্ন বিধি যজ্ঞ ও জপ যজ্ঞ নামে আরও দুইটি যজ্ঞ আছে, দর্শ পূর্ণ মাস প্রভৃতি কর্ম্মের নাম বিধি যজ্ঞ, ইহাও পাক যজ্ঞের অন্তর্ভূত এবং প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্র্যাদি জপের নাম জপ যজ্ঞ। ব্রহ্ম যজ্ঞ হইতে অতিরিক্ত এই ছয় প্রকার যজ্ঞের মধ্যে জপ যজ্ঞই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, যথা মনু।

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টোদশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রোমানসঃ স্মৃতঃ।

২ অধ্যায় ৮৫ শ্লোক।

বিধি বিষয়ক দর্শ পূর্ণ মাস প্রভৃতি যাগ অপেক্ষা প্রণব গায়ত্র্যাদির জপ রূপ যজ্ঞ দশ গুণ শ্রেষ্ঠ, সেই জপ যদি উপাংশু রূপে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সমীপস্থ লোকেও শুনিতে না পায়, তাহা হইলে তাহা শত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়, আর মানস জপ অর্থাৎ যে জপে জিহ্বা ও ওষ্ঠ স্পন্দিত না হয়, তাহা সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ।

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।

২ অধ্যায় ৮৬ শ্লোক।

চারি প্রকার যে পাক যজ্ঞ, দর্শ পূর্ণ মাস প্রভৃতি বিধি যজ্ঞের সহিত, তৎসমুদায়, জপ যজ্ঞের ষোড়শী কলারও যোগ্য হয় না।

বেদোক্ত অপর কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়াও কেবল প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ দ্বারাই ব্রাহ্মণেরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, যথা মনু।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রোব্রাহ্মণ উচ্যতে।

২ অধ্যায় ৮৭ শ্লোক।

ব্রাহ্মণ কেবল জপ দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই, তিনি যাগাদি অন্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, তাঁহাকে সর্ব্ব জীবের মৈত্র ব্রাহ্মণ বলা যায়।

এক্ষণে প্রণব ও ব্যাহৃতি সহিত সাবিত্রীই সর্ব্ব বেদ স্বরূপ এবং উহা গ্রহণ করিলেই সকল বেদ গ্রহণ করা হয়, ইহা প্রতিপন্ন করা যাইতেছে, যথা মনু।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ।

২ অধ্যায় ৭৬ শ্লোক।

ওঙ্কারের অবয়বী ভূত অকার, উকার ও মকার এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি বেদত্রয় হইতে প্রজাপতি ক্রমে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ত্রিভ্যএব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।

২ অধ্যায় ৭৭ শ্লোক।

তিন বেদ হইতে এক এক পাদ করিয়া ঋক্স্বরূপাত্মিকা সাবিত্রীর তিন পাদ, পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ক্রমে উদ্ধার করিয়াছেন।

ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং।

২ অধ্যায় ৮১ শ্লোক।

ব্রহ্ম প্রাপ্তির কারণ ওঙ্কার ও ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহাব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী, ইহাকে বেদের আদি বলিয়া জানিবে।

এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে।

২ অধ্যায় ৭৮ শ্লোক।

এই প্রণব ও ব্যাহৃতি পূর্ব্বিকা এই গায়ত্রী উভয় সন্ধ্যায় যে ব্রাহ্মণ জপ করেন, সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বেদত্রয় অধ্যয়নের পুণ্য প্রাপ্ত হয়েন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৩। ১ ফাল্গুন শুক্রবার।

Registered No 52.

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩৭৯ সংখ্যা। চৈত্র ১৭৯৬ শক. ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

প্রাতঃ স্মর্ত্তব্য।
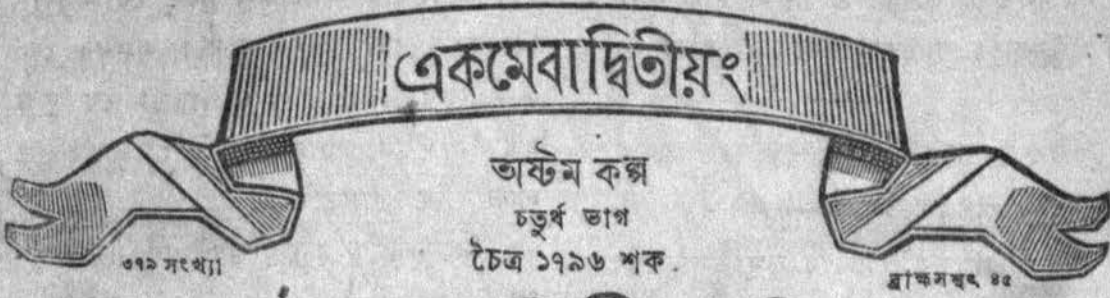
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

ব্রাহ্মধর্ম্মে এই রূপ বিধি আছে যে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া এই শ্লোক পাঠ পূর্ব্বক সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। শ্লোকটি প্রাতঃকালে স্মরণ করিবার বিলক্ষণ উপযোগী। যখন আমরা ভূলোকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, তখন সেই লোকেশ পরমেশ্বরকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য. এই জন্য প্রথমে "লোকেশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা কোন অচেতন পদার্থের সম্মুখে কার্য্য করিতেছি না; চৈতন্যময় পুরুষের সম্মুখে কার্য্য করিতেছি; এই জন্য "চৈতন্যময়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি চৈতন্যময়, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ। তিনি তাঁহার জ্ঞান চক্ষু দ্বারা আমাদিগের মনের নিগূঢ় অভিসন্ধি সকল অনুভব করিতেছেন, অতএব তাঁহার সম্মুখে সাবধান হইয়া কার্য্য-করা কর্ত্তব্য। তিনি বৈকুণ্ঠ অথবা স্বর্গ রূপ কোন দূর স্থান হইতে আমাদিগকে অনুভব করিতেছেন, এমত নহে। তিনি বিষ্ণু ও অধিদেব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ও জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাকে সন্নিকট জানিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি মঙ্গল পুরুষ—তিনি জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি জগতের মঙ্গল সাধন করিতে আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন, ইহা উজ্জ্বল রূপে প্রতীতি করিলে জগতের হিত সাধনে যেরূপ প্রবৃত্তি জন্মে, এমন আর অন্য কিছুতেই জন্মে না, এই জন্য এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে সেই মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে আমি সংসার যাত্রায় প্রবৃত্ত হইতেছি। "ভবদাজ্ঞয়ৈব" শব্দে ঈশ্বর পিতা ও রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি কেবল আমাদের পিতা ও রাজা নহেন, তিনি আমাদিগের প্রেমাস্পদ। সেই প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের প্রীতি উদ্দেশে জগতের হিত সাধন করা কর্ত্তব্য, এই জন্য "তব প্রিয়ার্থং" বাক্য এ-স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। জগতের হিত সাধন করা এমত গুরুতর কার্য্য যে ঈশ্বরের আদেশ পালন ও তাঁহার প্রীতি সম্পাদন ব্যতীত কেবল তাহার গুরুত্ব প্রতীতি করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এই জন্য এখানে "হিতায় লোকস্য" স্বতন্ত্র রূপে উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকটি কি সুন্দর! প্রাচীন ঋষিদিগের গভীর জ্ঞান ও পরমার্থদৃষ্টি ইহাতে কি উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

বেদান্ত-দর্শন।

(কমটির মতের সহিত ঐক্যানৈক্য)

ইতি পূর্ব্বে দেখা গেল যে, কমৃটি মনুষ্যত্বকে মনুষ্য হইতে স্বতন্ত্র-রূপে কল্পনা করিয়া মনুষ্যের যে কিছু মহত্ত্ব, কি জ্ঞান-বিষয়ক, কি ধর্ম্ম-বিষয়ক, কি প্রীতি-বিষয়ক, সমস্তই সেই এক কল্পিত দেবতার স্কন্ধে আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। কমৃটি যাহা বলেন তাহার ভাব এই—মনুষ্য-বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে মনুষ্যের ব্যক্তি-গত ভাব এবং তাহার জাতি-গত ভাব, এই দুইটি বিষয়, দুই প্রকারে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় আলোচনা করিবার প্রথা কি রূপ? না তাহার মস্তকের আয়তন পরীক্ষা করিয়া তাহার মনের বৃত্তান্ত সকল অবগত হওয়া। তাহার জাতি-গত বিষয় আলোচনা করিবার প্রথা কি রূপ? না পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে সার সংগ্রহ করা। মনুষ্যের জাতি-গত ভাবকেই কমৃটি মনুষ্যত্ব শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, "মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় পুরাবৃত্তের আলোচনীয় নহে, অথচ তাহার জাতি-গত বিষয় পুরাবৃত্তের আলোচনীয়," কমৃটির ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তি যে, এ রূপ কথা বলিতে পারিলেন ইহা অতীব আশ্চর্য্য। প্রথমতঃ মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় জানিবার জন্যই তাহার জাতি-গত বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়; তদ্ভিন্ন তাহাতে আর কোন প্রয়োজন নাই। অশ্ব-জাতির খুর আছে, এতথ্যটি জানিবার এই মাত্র প্রয়োজন যে, অশ্ব-বিশেষ দেখিবা-মাত্র তাহার খুর আছে ইহা আমরা না দেখিয়াও বলিতে পারিব। মনুষ্য-জাতি জ্ঞান-ধর্ম্ম উন্নতিশীল ইহা জানিবার প্রয়োজন এই যে, মনুষ্য-বিশেষকে দেখিলেই আমরা জানিব যে, এ ব্যক্তির জ্ঞান ধর্ম্ম আপাততঃ যে রূপ হউক না কেন, সাধন-দ্বারা তদপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতে পারে।

নিম্ন লিখিত প্রশ্নোত্তর দ্বারা সমস্ত সুস্পষ্ট হইবে।

প্রশ্ন। পুরাবৃত্ত পাঠে কি জানা যায়?

উত্তর। মনুষ্যের জাতি-গত ভাব।

প্রশ্ন। মনুষ্যের জাতি-গত ভাব জানিলে কি জানা হয়?

উত্তর। মনুষ্যের ব্যক্তি-গত ভাব।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে মনুষ্যের জাতি-গত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের ব্যক্তি-গত ভাবও জানা যায়।

উল্লিখিতের দৃষ্টান্ত।

১। পুরাবৃত্ত পাঠে নিশ্চিত জানিলাম যে, মনুষ্য-জাতি চিরোন্নতিশীল।

২। তাহাতে কি জানা হইল? না তজ্জাতীয় ব্যক্তি-সকল চিরোন্নতিশীল।

যদি বল যে মনুষ্য মৃত্যুর পরেও উন্নতি লাভ করিবে, ইহা যখন প্রত্যক্ষের অগোচর, তখন তাহা কি রূপে নিশ্চিত জানা যাইবে? তাহার উত্তর এই যে পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন-দ্বারা যদি মনুষ্য-জাতির অনন্ত চিরোন্নতি, যাহা প্রত্যক্ষের নিতান্ত অবিষয়, তদ্বিষয়ে নিশ্চিত জানা সম্ভব হইল, তবে প্রতি মনুষ্যের অনন্ত উন্নতি প্রত্যক্ষের অগোচর বলিয়া যে জ্ঞানের অগোচর হইবে এ কথা কি রূপে রক্ষা পাইতে পারে?

মনুষ্যের ব্যক্তি-ঘটিত সিদ্ধান্তটি তদীয় জাতি-ঘটিত সিদ্ধান্তটির উপর নির্ভর করিতেছে, সুতরাং যদি পূর্ব্বোক্তের মধ্যে কোন দোষ দৃষ্ট হয়, তবে সে দোষ শেষোক্তে পৌঁছিবে, কেন না শেষোক্তই পূর্ব্বোক্তের মূল

স্বরূপ। কম্‌টি মনুষ্যের জাতি-ঘটিত চিরোন্নতি নিশ্চিত বলিয়া মানেন, ব্যক্তি-ঘটিত চিরোন্নতি নিশ্চিত বলিয়া মানেন না। যিনি হিমালয়ের উত্তরে কখনো গমন করেন নাই, এবং তদীয় কোন বৃত্তান্ত কাহারো মুখে কখন শ্রবণ করেন নাই, তিনি যদি বলেন "হিমালয়ের আর এক পৃষ্ঠ আছে ইহা আমি মানি, কিন্তু চন্দ্রের আর এক পৃষ্ঠ আছে ইহা আমি মানি না" ইহাতে যেমন তাঁহার পক্ষপাতিতা ধরা পড়ে, মনুষ্য জাতির অপ্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎ চিরোন্নতি মানি, কিন্তু মনুষ্য-ব্যক্তির উক্ত রূপ চিরোন্নতি মানি না" ইহাতেও সেই রূপ। মনুষ্য-ব্যক্তির চিরোন্নতি লইয়াই মনুষ্য-জাতির চিরোন্নতি; সুতরাং মনুষ্য-জাতির অনন্ত চিরোন্নতি স্বীকার করিলে মনুষ্য-ব্যক্তিরও অনন্ত চিরোন্নতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা না করিয়া, কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যায় না।

"মনুষ্যের ব্যক্তি-গত বিষয় পুরাবৃত্তের আলোচ্য নহে, কেবল তাহার জাতি-গত বিষয়ই পুরাবৃত্তের আলোচ্য" কম্‌টির একথার অলীকত্ব প্রথম দৃষ্টি-ক্ষেপেই প্রকাশ পায়। জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ যে ব্যক্তি-জ্ঞানকে ছাড়িয়া জাতি-জ্ঞান হইতেই পারে না। যদি কেহ বলেন যে, "অশ্বজাতির খুর আছে" ইহা আমি জানি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অশ্বের খুর আছে কি না তাহা বলিতে পারি না, তবে তাঁহাকে কি উপাধি দেওয়া গিয়া থাকে? কিন্তু তদনুরূপ যদি কেহ বলেন যে, পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন দ্বারা মনুষ্য-জাতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু সে প্রণালী অনুসারে তজ্জাতীয় ব্যক্তি-বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না, তবে তাঁহাকে এইরূপ বলা আবশ্যক হয় যে, যে প্রণালীতেই হউক না কেন যদি জাতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাক, তবে ব্যক্তি-বিষয়েও জ্ঞান লাভ করিয়াছ; যদি এমন হয় যে, ব্যক্তি বিষয়ে কিছুই জান না তবে জাতি-বিষয়েও কিছুই জান না।

দ্বিতীয়তঃ "শুদ্ধ কেবল মস্তিষ্ক পরিমাপন প্রণালী দ্বারাই ব্যক্তি-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, অন্য কোন প্রকারে ব্যক্তি-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিলে তাহা বৈজ্ঞানিক হইবে না" কম্‌টি এই রূপ এক কঠোর নিয়ম সৃষ্টি করিয়াছেন। মস্তিষ্ক পরিমাপন না করিয়া আমরা কি ব্যক্তি-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি না? কম্‌টি বলিবেন "করিয়া থাক বটে, কিন্তু তাহা অবৈজ্ঞানিক।" কম্‌টিকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া যদি তাহার গুণাগুণ অবগত হওয়া যায়, তবে তাহাই বা বৈজ্ঞানিক না হয় কেন, এবং যদি মনুষ্য জাতির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অনুধাবন করিয়া তদীয় গুণাগুণ অবগত হওয়া যায়, তবে তাহাই বা বৈজ্ঞানিক হয় কেন? আলোচ্য-বিষয় ভিন্ন হইলেই ভিন্ন প্রণালীতে আলোচনা করিতে হইবে—এ কি রূপ যুক্তি? তাহা হইলে ত কোন দুই বিষয় এক প্রণালীতে আলোচিত হইতে পারে না? তাহা হইলে ব্যাঘ্র-বিষয়ক আলোচনার প্রণালী স্বতন্ত্র সিংহ-বিষয়ক আলোচনার প্রণালী স্বতন্ত্র, এই রূপ প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের এক একটি স্বতন্ত্র প্রণালী আবশ্যক হইয়া উঠে। অতএব একই প্রণালী অনুসারে যদি দুই বিষয় অথবা সহস্র বিষয় আলোচনা করিতে পারা যায়, তবে একের বেলা তাহা বৈজ্ঞানিক হইবে এবং অন্যের বেলা তাহা অবৈজ্ঞানিক হইবে, ইহা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। ঐতিহাসিক প্রণালী যদি বৈজ্ঞানিক হয়, তবে তাহা সর্ব্বত্রই বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইবে; প্রত্যুত ইহার বেলা বৈজ্ঞানিক হইবে উহার বেলা হইবে না,"

জাতির বেলা বৈজ্ঞানিক হইবে ব্যক্তির বেলা হইবে না, একপ স্বকপোল-কল্পিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করা বলের পক্ষেই শোভা পায় বিজ্ঞানের পক্ষে কদাপি শোভা পায় না।

তবে যদি এমন হয় যে, ঐতিহাসিক প্রণালী কেবল মনুষ্য জাতির উপরেই প্রয়োগ করিতে পারা যায়, ব্যক্তি-বিশেষের উপর প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, তবে কাজে কাজেই শেষোক্তের পক্ষে নূতনতর প্রণালী আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের ইতিবৃত্ত ব্যতীত জাতি সাধারণের ইতিবৃত্ত একেবারেই অসম্ভব, অমুক রাজার ইতিবৃত্ত, অমুক বিদ্রোহীর ইতিবৃত্ত, অমুক পণ্ডিতের ইতিবৃত্ত, এই রূপ ব্যক্তি বিশেষের ইতিবৃত্তকে ছাড়িয়া যখন মনুষ্য-জাতির ইতিবৃত্ত হইতেই পারে না, তখন ঐতিবৃত্তিক প্রণালী ব্যক্তি-বিশেষে প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, একপ একটা অসঙ্গত কথা বলিতে কে সাহসী হইবেন?

যদি বল যে, ঐতিবৃত্তিক প্রণালীকে একপ করিয়া পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে যে তাহাতে কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামোল্লেখ থাকিবে না, কেবল শ্রেণী-বিশেষের নামোল্লেখ থাকিবে; যথা রাজ-পুরুষেরা অমুক কার্য্য করিলেন, প্রজারা অমুক কার্য্য করিল, পণ্ডিতেরা অমুক কার্য্য করিলেন, সৈন্যেরা অমুক কার্য্য করিল ইত্যাদি; তবে তাহার উত্তর এই যে, ও রূপ করিলে ঐতিহাসিক প্রণালীর অবনতিই সাধন করা হয়, উন্নতি সাধন করা হয় না। কেন না তোমার দৃষ্টান্ত-অনুসারে যখন আর এক বীর আসিয়া বলিবেন যে, ইতিবৃত্তের মধ্যে শ্রেণীরও নামোল্লেখ করা হইবে না শুদ্ধ কেবল জাতির নামোল্লেখ থাকিবে, যথা ইউরোপীয় জাতি অমুক কার্য্য করিল, ফরাশীশ জাতি অমুক কার্য্য করিল, ইত্যাদি; এবং তাহার পরে আবার যখন ততোধিক পরাক্রমশালী আর এক জন আসিয়া বলিবেন যে, জাতি-বিশেষেরও নামোল্লেখ করা হইবে না, ইতিবৃত্তের মধ্যে কেবল সাধারণ মনুষ্য জাতির নামোল্লেখ থাকিবে; তখন তুমি আপনিই সেই সকল দ্রুতগামী ছাত্রদিগকে নিবারণ করিতে পথ পাইবে না। ইতিবৃত্তের প্রকৃষ্ট গঠন প্রণালী এই রূপ—বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এক-একটি কেন্দ্র-স্বরূপ; প্রধান-তম ব্যক্তি প্রধান-তম কেন্দ্র; অধীনস্থ ব্যক্তি অধীনস্থ কেন্দ্র। প্রত্যেক ঐতিবৃত্তিক ব্যক্তির প্রথম পরিধি তদীয় শ্রেণী, দ্বিতীয় পরিধি তদীয় জাতি, শেষ পরিধি মনুষ্য-জাতি। প্রথমতঃ ব্যক্তি-বিশেষের সহিত শ্রেণীর এবং জাতির কিরূপ সম্বন্ধ; যথা নেপোলিয়নের সহিত সৈন্য শ্রেণীর, ফরাশীশ জাতির এবং অন্যান্য জাতির কি রূপ সম্বন্ধ: দ্বিতীয়তঃ জাতি-বিশেষের বা শ্রেণী-বিশেষের অন্তর্গত ব্যক্তির সহিত, অপর জাতীয় বা অপর অপর শ্রেণীস্থ ব্যক্তির কি রূপ সম্বন্ধ; যথা, সৈন্য শ্রেণীস্থ ব্যক্তির সহিত রাজ-পুরুষ শ্রেণীস্থ ব্যক্তির কি রূপ সম্বন্ধ, ফরাশীশ-জাতীয় ব্যক্তির সহিত ইংলণ্ড জাতীয় ব্যক্তির কি রূপ সম্বন্ধ; ইত্যাদি রূপ যত প্রকার ঐতিবৃত্তিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। আমরা নিজে ব্যক্তি, এই জন্য ব্যক্তি-বিশেষের ইতিবৃত্ত পাঠে আমাদের লাভ-বোধ হয়। ফরাশীশ বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত পাঠ কর, দেখিবে যে, লুই, মিরাবো দান্তন, মাডাম্ রোলাণ্ড্, রবস্পিয়র্, মারাট্, নেপোলিয়ন এই রূপ নানা ব্যক্তির ইতিবৃত্ত তাহার মধ্যে অন্তর্ভুত রহিয়াছে। আরো দেখিবে যে, উক্ত ব্যক্তি সকলের প্রত্যেকে এক-একটি কেন্দ্র-স্বরূপ, এবং জিরণ্ডিষ্ট্, জেকবাইট্ প্রভৃতি শ্রেণী সকল তাহারদের পরিধি-স্বরূপ। ফরাশীশ বিদ্রোহের ইতি-

বৃত্ত হইতে যদি উক্ত ব্যক্তি-সকলের ইতি-বৃত্ত উঠাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার ফল এই হইবে যে উক্ত বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত পাঠে কাহারও কিছু মাত্র লাভ বোধ হইবে না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে ইতিবৃত্ত মাত্রই ব্যক্তি-নিষ্ঠ। অতএব কেবল জাতির প্রতিই ঐতিবৃত্তিক প্রণালী খাটে ব্যক্তির প্রতি খাটে না এ কথা নিতান্ত অলীক। ব্যক্তিই যে ইতিবৃত্তের প্রধান আলোচ্য-বিষয় তাহা কেবল নহে, ইতিবৃত্তের মূল-আদর্শ কেবল ব্যক্তির অভ্যন্তরেই বিদ্যমান দেখা যায়, অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক মনুষ্যের স্মরণ-রূপ গ্রন্থে তাহার ব্যক্তি-গত ইতিবৃত্ত যত টুকু লিখিত আছে, তাহা যেমন নিঃসংশয়, কোন শ্রুত ইতিবৃত্ত তেমন নিঃসংশয় হইতে পারে না। অতএব স্মরণ-নিহিত ব্যক্তি-গত ইতিবৃত্ত অন্যান্য তাবৎ ইতিবৃত্তের আদর্শ স্বরূপে গণ্য হইতে পারে। অন্যান্য ইতিবৃত্তের সহিত এই আভ্যন্তরিক ইতিবৃত্তের প্রভেদ এই যে, অন্যান্য ইতিবৃত্ত বাহ্য-দৃষ্টি দ্বারা পাঠ করিতে হয়, কিন্তু এ ইতিবৃত্ত অন্তর্দৃষ্টির সাহায্য ব্যতিরেকে পাঠ করিতে পারা যায় না। কম্‌টি অন্তর্দৃষ্টি মানেন না। কম্‌টির সহিত কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিম্ন লিখিত প্রশ্নোত্তর চলিতে পারে।

জিজ্ঞাসু—গত কল্য আমি যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা জানিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। কি উপায়ে তাহা জানিতে পারি?

কম্‌টি—গত কল্য যাঁহারা তোমার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসু—তাঁহাদের কেহই উপস্থিত নাই।

কম্‌টি—তাহা যদি হয় তবে গত কল্য কি কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহা স্মরণ করিয়া দেখ।

জিজ্ঞাসু—"স্মরণ করিয়া দেখ" একথার অর্থ কি?

কম্‌টি—অর্থাৎ গত কল্য তুমি যাহা যাহা অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহার প্রতি মনোনিবেশ কর।

জিজ্ঞাসু—অন্তরে মনোনিবেশ করা তোমার মতে নিষিদ্ধ, অতএব যখন মনোনিবেশ করিতে বলিতেছ তখন বাহিরেই মনোনিবেশ করিতে বলিতেছ। কিন্তু গত কল্য আমি যাহা করিয়াছিলাম, বাহিরে তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতেছি না। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য?

ইহার উত্তরে কম্‌টি যাহা কেন বলুন না, জিজ্ঞাস্য বিষয়ের একমাত্র সদুত্তর এই যে, অন্তরে মনোনিবেশ করাই কর্ত্তব্য। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে সামান্য সামান্য বিষয়েও অন্তর্দৃষ্টি পরিচালনা করা আবশ্যক হয়।

কম্‌টি বলেন যে, পুনরাবৃত্তির বা অভ্যাসের বা সংস্কারের যে একটি নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা স্মরণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে, যাহা সংস্কার-মূলক, তাহা স্বতন্ত্র এবং যাহা অধ্যবসায়-মূলক তাহা স্বতন্ত্র। "আমি অমুক স্থানে যাইব" এই রূপ অধ্যবসায় করিয়া আমি যদি পদচালনা করি, তবে তাহা অধ্যবসায়-মূলক; যখন দৈনিক অভ্যাস-বশতঃ সময় বিশেষে অন্যমনস্ক হইয়া পদচালনা করি, তখন তাহাই সংস্কার-মূলক। ইত্যনুরূপ যখন গত কল্যের কোন ঘটনা আপনা আপনি মনে আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন তাহাই সংস্কারের নিয়মে হইয়া থাকে, কিন্তু "আমি অমুক বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখি" এই রূপ মনে করিয়া যখন গত কল্যের ঘটনা-বিশেষের প্রতি প্রণিধান করি, তখনকার সেই যে প্রণিধান-ক্রিয়া তাহা সংস্কার-

মূলক নহে প্রত্যুত তাহা অধ্যবসায়-মূলক। অতএব অধ্যবসায়-মূলক স্মরণ-সম্বন্ধে একথা বলিলে চলিবে না যে, উহা সংস্কারের নিয়মে হইয়া থাকে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, অন্তর্দৃষ্টি কোন রূপেই উপেক্ষণীয় নহে। কেবল যে ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতি-নিহিত ইতিবৃত্ত পাঠ করাতেই অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক হয় তাহা নহে, মনুষ্য-জাতিরও ইতিবৃত্তের নিগূঢ় অর্থ অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি আবশ্যক হয়। মনুষ্য জাতির জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি কি রূপে হইয়া আসিতেছে, ইহা জানিতে হইলে জ্ঞান-ধর্ম্ম যে কি তাহা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করা আবশ্যক; কেন না জ্ঞান ধর্ম্ম চক্ষে দেখিবার বস্তু নহে। জ্ঞান ধর্ম্মের কার্য্য চক্ষে দেখা যায় বটে, কিন্তু জ্ঞান ধর্ম্মের কার্য্য মাত্র জানিলে জ্ঞান ধর্ম্মের কিছুই জানা হয় না। এক জন যশের জন্য একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করিল, এক জন পরোপকারের জন্য তাহাই নির্ম্মাণ করিল, এস্থলে কার্য্য উভয়েরই সমান; তবে কেন এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেছি? ইহার কারণ এই যে, কার্য্য-মাত্র ধর্ম্ম-ভাবের পরিচায়ক নহে। জ্ঞান-বিষয়েও এই রূপ; মধুমক্ষিকারা সংস্কার বশতঃ যেরূপ তাহাদের বাস গৃহকে নানা প্রকার কার্য্যোপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করে, সেই রূপ করিয়া যদি মনুষ্য আপনার বাস গৃহ নির্ম্মাণ করে, তবে কার্য্যোপযোগিতা বিষয়ে উভয়ের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও একটি যে, জ্ঞান-পূর্ব্বক নির্ম্মিত, এবং একটি যে, সংস্কার-পূর্ব্বক নির্ম্মিত, ইহা কিছুতেই ব্যত্যয় হইবার নহে। অতএব যাঁহারা বলেন যে জ্ঞান-ধর্ম্মের কার্য্য মাত্র দেখিয়া জ্ঞান ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, তাঁহাদের সে কথা অলীক। জ্ঞান ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যক। "অমুক ব্যক্তি অমুক কার্য্য করিয়াছিল" এই পর্য্যন্ত জানিলেই কি ইতিবৃত্ত বিজ্ঞানের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না? উক্ত কার্য্য কি ভাবে করিয়াছিল, ইহা জানিবার কি অবশিষ্ট থাকে না? নেপোলিয়ন জর্ম্মণ্ দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন" এই মাত্র জানিলে জানিবার উপযুক্ত কিছুই জানা হয় না; কি অভিপ্রায়ে নেপোলিয়ন ওরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা জানিতে না পারিলে জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া বোধ হয় না। নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত পাঠে এইরূপ জানিতে পারা যায় যে, পৃথিবী জয় করিয়া ফরাশীশ দেশকে সমুদায়ের রাজধানী স্বরূপ করিবার জন্য নেপোলিয়নের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; এই ইচ্ছার প্রাবল্য হেতু তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই; যাহা কিছু তাঁহার সেই ইচ্ছার পোষকতা করিয়াছিল তাহাই তাঁহার নিকটে কার্য্য, আর সমুদায়ই অকার্য্য হইয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তিগত বৃত্তান্ত-সমূহের আলোচনা দ্বারা আমরা অনেক বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিতে পারি। যথা—

প্রশ্ন—কেমন করিয়া নেপোলিয়নের দুষ্ট ইচ্ছা আতিশয্য লাভ করিল?

উত্তর—পুনঃ পুনঃ জয়-লাভ দ্বারা।

প্রশ্ন—উক্ত ইচ্ছার মূল কি?

উত্তর—নেপোলিয়নের জিগীষা-বৃত্তি স্বভাবতই প্রবল। নেপোলিয়নের জিগীষা বৃত্তি যেমন-বীজ, ফরাশীশ্ দেশের তাৎকালিক রাজ্য-বিপ্লব তেমনি-ক্ষেত্র; উভয়ের সংযোগে যোজন যোজন ব্যাপী এক ভয়ানক সংগ্রাম-তরু উৎপন্ন হইল।

প্রশ্ন—নেপোলিয়নের ইতিবৃত্ত পাঠে কি শিক্ষা লাভ হয়?

উত্তর—নেপোলিয়ন যেমন এক দিকে দেশ-বিদেশ জয় করিতেছেন, অন্য দিকে

তাঁহার জিগীষা-বৃত্তি তাঁহাকে জয় করিয়েছে; ক্রমে ক্রমে তাঁহার জিগীষা-বৃত্তি তাঁহাকে এত দূর বশীভূত করিল যে, তিনি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইলেন এবং পরিশেষে চারি দিক্ হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সম্পদের শিখর হইতে বিপদের পাতাল-কূপে নিমগ্ন হইলেন, আর তাঁহার উত্থান শক্তি রহিল না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, "ফরাশীশ্ দেশের একাধিপত্য হউক্" এত দূর না গিয়া নেপোলিয়ন যদি ফরাশীশ্ দেশের ন্যায়-সঙ্গত উন্নতি সাধন ও সুশৃঙ্খল স্থাপনের দিকে যাইতেন, তাহা হইলে এক দিকে যেমন তিনি আপনার জিগীষা-বৃত্তির উপরে জয় লাভ করিতেন, অন্য দিকে তেমনি স্বদেশীয় বহু বিধ অমঙ্গলের উপর জয় লাভ করিতেন; ইহাতে তিনি আপনি এবং তাঁহার দেশ উভয়ই চরমে সুখ শান্তি ও উন্নতি লাভে কৃতকার্য্য হইতেন। নেপোলিয়নের ইতিবৃত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বচনটি জাজ্বল্যতর-রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে—"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥" এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে অবতীর্ণ হওয়া যাইতেছে:—উপরে দেখা গেল যে শুদ্ধ কেবল মনুষ্যের কার্য্য মাত্র অবগত হওয়া ইতিবৃত্ত আলোচনার উদ্দেশ্য নহে; পরন্তু মনুষ্যের সৎ অসৎ এবং উভয় মিশ্রিত ইচ্ছা হইতে কিরূপে কোন্ কার্য্য বহির্গত হয়; কি বা সেই ইচ্ছার পোষক, কি বা প্রতিবন্ধক; কি রূপই বা সেই ইচ্ছার গতি; সাধু ইচ্ছা কিসে সক্ষম হয়, কিসেই বা অক্ষম হয়; অসাধু ইচ্ছাই বা কিসে সক্ষম হয়, কিসে অক্ষম হয়; ইতিবৃত্ত পাঠে এই প্রকার আধ্যাত্মিক বিষয় সকল শিক্ষা করিতে পারিলে তাহাতে যেমন পাঠকের লাভ-বোধ হয়, কতকগুলা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মাত্র জানিলে কখনই সেরূপ লাভ-বোধ হয় না। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, আধ্যাত্মিক বিষয়-সকল জানিতে হইলে অন্তর্দৃষ্টি পরিচালনা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। আমি যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন প্রকার অভিপ্রায়ে কোন প্রকার কার্য্য করি, তবে সে অভিপ্রায় আমার আপনার নিকটে অবিদিত থাকিতে পারে না; কিন্তু সেই যে অভিপ্রায় তাহা আমি চক্ষেও দেখি না, কর্ণেও শুনি না, তাহা স্পর্শও করি না, আঘ্রাণও করি না, আস্বাদনও করি না, অথচ আমি চক্ষে দেখার ন্যায় স্পষ্ট রূপে জানিয়া থাকি। যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আপনার অভিপ্রায় প্রভৃতি আন্তরিক বিষয় সকল জ্ঞাত হইয়া থাকি, তাহা বাহ্য দৃষ্টি নহে, তাহা অন্তর্দৃষ্টি। কম্‌টি এস্থলে এই রূপ আপত্তি করিবেন যে ক্ষুধাকেও আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না অথচ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়া থাকি, যে জ্ঞানে ক্ষুধা উপলব্ধি হয় তাহাকে কি অন্তর্দৃষ্টি বলিব? ক্ষুধা-জ্ঞান এবং ক্ষুধা উভয়ের মধ্যে প্রভেদই বা কি? ক্ষুধা-জ্ঞান হওয়ার নামই ক্ষুধা হওয়া; অতএব উভয়কে পৃথক্ দৃষ্টিতে দেখা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। ইহার উত্তর এই যে, ক্ষুধা যতক্ষণ বর্ত্তমান, ততক্ষণই যদি কেবল ক্ষুধা-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলেই কম্‌টির কথা সত্য হইত; কিন্তু যখন দেখা যায় যে ক্ষুধা তিরোহিত হইলেও ক্ষুধা বিষয়ক জ্ঞান থাকিবার কোন বাধা নাই, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ক্ষুধা-বিষয়ক জ্ঞান ক্ষুধা অপেক্ষা ব্যাপক, সুতরাং ভিন্ন। ক্ষুধা যে কি, তাহা যে কেবল ক্ষুধার সময়েই আমরা জানি তাহা নহে, ক্ষুধা যখন নাই তখনও তাহা আমরা জানি, এবং জানি বলিয়াই অদ্যকার ক্ষুধা শান্তি হইলে কল্যকার ক্ষুধা যাহাতে শান্তি হইবে তাহার বিহিত উপায় অবলম্বন করি। ক্ষুধা-জ্ঞান

ভূত-কালের ক্ষুধা নিবৃত্ত জানিয়াও আমার-দিগকে ভবিষ্যতের অন্ন আয়োজনে সচেষ্ট করে, কিন্তু ক্ষুধা আমাদিগকে বর্ত্তমান অভাব মোচনেই সচেষ্ট করে; অতএব ক্ষুধার অবর্ত্তমানেও যখন ক্ষুধা-জ্ঞান থাকিতে পারে, এবং ক্ষুধার কার্য্য ক্ষুধা-জ্ঞানের কার্য্য যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন উভয়ই যে একই, ইহা কোন রূপেই বলা যাইতে পারে না। তবে, ক্ষুধা-জ্ঞানকে অন্তর্দৃষ্টি বলা যাইবে কি না,একথা অবশ্য জিজ্ঞাস্য হইতে পারে।

কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করিলেই, তাহার কোন না কোন কারণ আছে, এ বিশ্বাস দর্শকের মনে তৎক্ষণাৎ উদয় হইয়া থাকে। যখন বাহিরের কোন কারণ-বশত দর্শকের অন্তরে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন সেই পরিবর্ত্তনের মূল বাহিরে আছে বলিয়া দর্শকের দৃষ্টি বহির্দিকেই ধাবিত হয়, এবং যখন দর্শকের ভিতরের কোন কারণ বশতঃ বাহিরে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন সেই পরিবর্ত্তনের মূল ভিতরে আছে বলিয়া দর্শকের দৃষ্টি অন্তর্দিকেই ধাবিত হয়। শরীরের পরমাণু হ্রাস প্রভৃতি বাহিরের কারণ-বশতঃ ক্ষুধা-রূপ পরিবর্ত্তন অন্তরে উপস্থিত হয়, এ জন্য ক্ষুধা-বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে বহির্দিকেই অর্থাৎ শরীরের দিকেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে হয়। পরন্তু যখন দর্শকের নিজের আন্তরিক ইচ্ছা বশতঃ কোন প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তখন তদ্বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে হইলে অন্তরে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক হয়। ইহা বলা বাহুল্য যে, দৃষ্টি শব্দের অর্থ এখানে মনোনিবেশ, শুদ্ধ কেবল বচন-সংক্ষেপের জন্য দৃষ্টি শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। অতএব যাহার মূল দর্শকের অন্তরে, এমন কোন আবির্ভাব উপলক্ষেই অন্তর্দৃষ্টি শব্দের সার্থকতা হয়; নচেৎ ক্ষুধা প্রভৃতি বহির্বস্তু ঘটিত আবির্ভাব উপলক্ষে অন্তর্দৃষ্টি শব্দ ব্যবহার করিলে উক্ত শব্দ নিতান্তই নিরর্থক হইয়া পড়ে, কেন না তাহা হইলে বহির্দৃষ্টিকেও অন্তর্দৃষ্টি বলিবার বাধা থাকে না।

প্রশ্ন—বস্তু-সকলের বর্ণ চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারা যখন মনে উপলব্ধি হয়, তখন সেই বর্ণ-জ্ঞানকে অন্তর্দৃষ্টি না বলি কেন?

উত্তর—যেহেতু আলোক-প্রক্ষেপ বা প্রতিক্ষেপকারী বর্ণ-বোধের যে, কারণ, তাহা বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে, এ জন্য বর্ণ-জ্ঞানের লক্ষ বাহিরে। ক্ষুধা সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ বলা যাইতে পারে, যথা—

প্রশ্ন—শরীরের পরমাণু হ্রাস জনিত যখন আমাদের মনে ক্ষুধা-রূপ একটি অভাব বোধ হয়, তখন তদীয় জ্ঞানকে আমরা অন্তর্দৃষ্টি না বলি কেন?

উত্তর—যেহেতু ক্ষুধা-জ্ঞানের কারণ শারীরিক; শরীর বাহ্য-পদার্থ; এজন্য ক্ষুধা জ্ঞানের লক্ষ বাহিরে; সুতরাং বর্ণ-জ্ঞানকে যেমন অন্তর্দৃষ্টি বলা সঙ্গত নহে; ক্ষুধা-জ্ঞানকেও সেই রূপ অন্তর্দৃষ্টি বলা সঙ্গত নহে। কম্‌টির মতে, ক্ষুধা-জ্ঞান এবং ক্ষুধা-বোধ এ দুয়ের মধ্যে যেন প্রভেদ নাই, এই রূপ দাঁড়ায়; কিন্তু ক্ষুধা-বোধ ক্ষুধার সঙ্গে আইসে ক্ষুধার তিরোধানেই তিরোহিত হয়, ক্ষুধা-বিষয়ক জ্ঞান ক্ষুধার বর্ত্তমানতাকে অপেক্ষা করে না; এ জন্য ক্ষুধা-জ্ঞান এবং ক্ষুধা-বোধ পরস্পর বিভিন্ন। কোন্ প্রকার জ্ঞানকে অন্তর্দৃষ্টি বলা যায়? না, এমন কোন আবির্ভাব যাহার কারণ দর্শকের বাহিরে অবস্থিতি করে না, অন্তরেই অবস্থিতি করে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই কেবল অন্তর্দৃষ্টি শব্দের বাচ্য। সূক্ষ্ম-রূপে দেখিতে গেলে, আত্মার অভ্যন্তরে যে-সকল পরাকাষ্ঠা মূল-তত্ত্ব মূল-আদর্শ এবং মূল-নিয়ম নিহিত আছে, তৎসমু-

দায়ই অন্তর্দৃষ্টির বিষয়, কেন না তাহারা বহির্বস্তুর উপর নির্ভর করে না *। আমাদের কর্তৃস্বাধীন বুদ্ধি, প্রীতি এবং ইচ্ছা সেই মূল-তত্ত্ব, মূল-আদর্শ এবং মূল-নিয়মের সহিত কত দূর ঐক্য হইল বা না হইল, ইহা নিরূপণ করাও অন্তদৃষ্টির কার্য্য। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, অন্তদৃষ্টি ভিন্ন অন্য কোন প্রকরণ দ্বারাই মনুষ্যের নিগূঢ় অভিসন্ধি, বুদ্ধি এবং ভাবকে পরিমাপন করিতে পারা যায় না, সুতরাং ইতিবৃত্তের সার-মর্ম্ম অবগত হইতে পারা যায় না। কি ব্যক্তি-বিশেষের স্মৃতি-গত নৈসর্গিক ইতিবৃত্ত, কি জাতি-বিশেষের শ্রুতি-গত ইতিবৃত্ত, অন্তদৃষ্টি পরিচালনা ব্যতিরেকে তাহা হইতে ফলোপার্জ্জন করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে।

কম্‌টি মনুষ্যের ব্যক্তি-গত ভাবকে তদীয় জাতি-গত ভাব হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে আলোচনা করাতে তিনি যে পূর্ব্বোক্তের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা এক্ষণে স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার পজিটিব্ ফিলজপি অন্য কোন জাতির জাতি এবং ব্যক্তিকে পরস্পর পৃথক্ প্রণালীতে আলোচনা করিতে বলেন না, কেবল মনুষ্য জাতির সম্বন্ধেই ঐরূপ করিতে বলেন। তিনি টৌলীয়দিগকে এণ্টিটি-প্রিয় বলিয়া উপহাস করিয়াছেন; কিন্তু জাতিকে ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া প্রকারান্তরে তিনি যে এণ্টিটির গ্রাসে পতিত হইয়াছেন, ইহা তিনি দেখিতে পান নাই। মনুষ্য-জাতি বিষয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মনুষ্য-ব্যক্তি বিষয়ে তাহা খাটে না। মনুষ্যত্ব মরণ-ধর্ম্ম রহিত এবং চিরোন্নতিশীল ইহা তাঁহার মতে নিশ্চিত, কিন্তু মনুষ্য-ব্যক্তি সে রূপ কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না। জাতিকে ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া কল্পনা করাতে বৈজ্ঞানিক ভাবের খর্ব্বতা এবং টৌলীয় ভাবের আতিশয্য প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যক্তি-বিষয়ক আলোচনা স্থগিত করিয়া জাতি-বিষয়ক আলোচনা করা যে অবৈজ্ঞানিক ইহা বলিতেছি না; বক্তব্য কেবল এই মাত্র যে, জাতি-বিষয়ে যাহা স্থির করিব, ব্যক্তির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, জাতি যেন ব্যক্তি হইতে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, এই প্রকার ভাবই অবৈজ্ঞানিক। মনুষ্যত্ব মরণ-ধর্ম্ম-রহিত ইহা বলিলেই যে, তাহা অবৈজ্ঞানিক উক্তি হয় তাহা নহে; পরন্তু যদি বলা যায় যে, মনুষ্য-জাতি মরণ-ধর্ম্ম-রহিত কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্য-ব্যক্তি যে মরণ-ধর্ম্ম-রহিত তাহা নহে; কিংবা চক্র-জাতির অর-সকল সমান, কিন্তু তাহা বলিয়া বিশেষ বিশেষ চক্রের যে অর-সকল সমান, তাহা নহে; এপ্রকার উক্তি নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ইহা বলা বাহুল্য। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী বিষয়ে পজিটিব্ ফিলজপি নিতান্ত অব্যবস্থিত ভাব প্রকাশ করিয়াছে। এক্ষণে কাল্পনিক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বেদান্ত হইতে কি রূপ উত্তর পাওয়া যায়, তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতেছে।

* তত্ত্ববিদ্যা দেখ।

ভারতবর্ষীয় নীতি-শাস্ত্র।

উপক্রমণিকা।

পুরাকালে এক জন প্রধানতম ঋষি কোন এক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "অনুষ্ঠেয়েষু লোকেস্মিন্ কিং কল্যাণকরং নৃণাং" ইহলোকে কল্যাণকর অনুষ্ঠেয় কি?— তাহাতে ঋষি উত্তর করিয়াছিলেন, "ভূতানামনুবর্ত্তী বিদ্যা সাহি সেব্যা সদা নরৈঃ।" প্রাণিদিগের বিদ্যাই কল্যাণ দায়িনী; অত-

এব মনুষ্যেরা তাহাকেই যেন সর্ব্বদা সেবা করে।

বস্তুতঃ ইহ জগতে যদি কিছু কল্যাণকর অনুষ্ঠেয় থাকে, তবে তাহা বিদ্যা। বিদ্যার ন্যায় কল্যাণকর অনুষ্ঠেয় আর দেখা যায় না। মুক্তি বা পারত্রিক মঙ্গলের আশা থাকিলে বিদ্যার আশ্রয় লইতে হইবে—আহার, বিহার, শস্ত্র, শাস্ত্র প্রভৃতি ঐহিক উপাদেয় বস্তুর প্রার্থনা থাকিলে বিদ্যার আশ্রয় ব্যতীত নিষ্পন্ন হইবে না; অতএব বিদ্যাই মানব জাতির পরম ধন।

বিদ্যার ফলাফল ও উত্তমাধম ভাব দেখিয়া পণ্ডিতেরা বিদ্যাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা।

পরা বিদ্যা কি?—অপরা বিদ্যাই বা কি? লক্ষণ নির্দ্দেশের নিমিত্তে শ্রুতি বাক্য আছে; "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—যাহার দ্বারা ঈশ্বরকে অধিগত করা যায়, তাহাকে পরা বিদ্যা বলে, তদ্ভিন্ন সমস্তই অপরা বিদ্যা।

ঐ অপরা বিদ্যার আবার অনেকবিধ অবান্তর ভেদ আছে। শস্ত্র বিদ্যা, শাস্ত্র বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা ইত্যাদি। ঋষিরা বলেন, অপরা বিদ্যার যতগুলি অবয়ব আছে, তন্মধ্যে নীতি বিদ্যাই জগতের উন্নিতি সাধক। ঋষিদিগের মতে মনুষ্য যদি শস্ত্র বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা সুপকার বিদ্যা, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়, আর তাহাতে যদি নীতি-সংযোগ না থাকে; তাহা হইলে সে মনুষ্য দ্বারা জগতের উপকার হয় না, প্রত্যুত অপকারই হয়। "নয়েন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্ব পণ্ডিতদিগের মতে নীতি বিহীন মনুষ্য পশুর তুল্য। আমাদের বিবেচনায় তত দূর না হউক, ফল, নীতি-শূন্য মনুষ্য যে জগতের ভূষণ হইতে পারে না, সে পক্ষে সংশয় নাই। আহার, নিদ্রা, ভয়, আলস্য প্রভৃতি যাহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহা পশু-সাধারণ। আহার, বিহারের চেষ্টা, বস্তু-পরীক্ষা ও শিল্পাদির অনুষ্ঠান মনুষ্যেরাও করে, পশুরাও করে; কিন্তু পশুরা যাহা করে; তাহা তাহাদের স্ব-প্রয়োজনোপযোগী মাত্র, আর যাহা মনুষ্যেরা করে, তাহা স্ব-পর সাধারণের প্রয়োজনোপযোগী। মানব কার্য্যের ও পাসব কার্য্যের এবম্বিধ প্রভেদ ঘটনার মূল কেবল মানব-মনে নীতি-সংযোগ থাকা। অতএব নীতি সংযোগ থাকা মানব অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম এবং ঐ অতিরিক্ত ধর্ম্মটি থাকাতেই মনুষ্যেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীব বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

নীতি সংযোগ মানব-অন্তঃকরণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া তুষ্ণীভাবে থাকা উচিত নহে। তাহার পরিশীলন করা কর্ত্তব্য। কবি-শক্তি ও সঙ্গীতের লয় জ্ঞান অন্তরে বিলীন থাকিলেও তাহার স্ফূর্ত্তির নিমিত্ত চর্চ্চা করা আবশ্যক।

বিদ্যা মাত্রই উপদেশ-লভ্য। উপদেশ সংস্কৃতাত্মা সাধু পুরুষের নিকট পাওয়া যাইতে পারে—আবার অকিঞ্চিৎকর জড়-পদার্থের নিকটেও পাওয়া যাইতে পারে। ভাগবতে একটি আখ্যায়িকা আছে। এই আখ্যায়িকার নাম চতুর্দ্দশ গুরূপাখ্যান। ঐ উপাখ্যানে লিখিত আছে, পূর্ব্বে যদু নামক রাজা, কোন এক তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের বিস্ময়কর ব্যবহার পদ্ধতি সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মন্! আপনি এরূপ অদ্ভুত চর্য্যা কোথায় শিক্ষা করিলেন?"—তাহাতে সেই অবধূত বেশধারী ব্রাহ্মণ উত্তর করিয়াছিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার গুরুগণের পরিচয় ইচ্ছা করিতেছেন সুতরাং আমি বলি, মনো-

যোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন—আমার গুরু পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য কপোত পক্ষী, অজগর সর্প, সিন্ধু, পতঙ্গ জাতি, মধুমক্ষিকা, গজ, মধু-ব্যবসায়ী, হরিণী, মীন, পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যা, কুরর পক্ষী, বালক, কুমারী, শরনির্ম্মাতা, সর্প; ঊর্ণনাভ (মাকড়শা পেশকৃৎ। ইহাঁদিগের নিকট আমি যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তৎসমুদায়ও শ্রবণ করুন।"

এই আখ্যায়িকার অন্তর্ম্মর্ম্ম এই যে মনুষ্য যদি স্থির ও শান্ত হইয়া প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করে, তাহা হইলে সে অত্যুত্তম জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অশান্ত চঞ্চল মতিরাই মনুষ্য গুরুর অন্বেষণ করিয়া ক্লান্ত হয়। এতাবতা, নীতি বিদ্যাও উপদেশ লভ্য এবং সে উপদেশ যেমন মনুষ্য গুরুর নিকট পাওয়া যায়, তেমনি প্রকৃতি গুরুর নিকটও পাওয়া যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যে সকল নীতি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, সে সমস্ত তাঁহারা কেবল মনুষ্য গুরুর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, প্রকৃতির নিকটও পাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে কোন্ সময় হইতে যে নীতি সঞ্চয় আরম্ভ হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সর্ব্ব প্রকার প্রাচীনগ্রন্থেই নীতির বিষয় দৃষ্ট হয়। ঈদৃশ গ্রন্থ দেখা যায় না, যাহাতে নীতি-চর্চ্চা নাই। যাহাই হউক, আর্য্যেরা যে কোন সময়ে যে কোন গুরুর নিকট হইতে হউক না কেন তাঁহারা যে সকল নীতি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশের পরিশীলন করিব কিন্তু কোন পুস্তক বিশেষের অনুগত হইব না।

ক্রান্তদর্শী উশনাকৃত ঔশনস-সূত্র (শুক্র-নীতি) বৃহস্পতিকৃত নীতিসার (বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন)—কালিকা পুরাণ ও গরুড় পুরাণ প্রভৃতি পুরাণ নিচয়ের অংশ বিশেষ—ভারতীয় সভা ও শান্তিপর্ব্বাদি—কামন্দক—পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ—নীতি ময়ূখ—নীতি সমুচ্চয়—নীতি চিন্তামণি প্রভৃতি বহুতর নীতি গ্রন্থ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এই সকল গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক যথা যথ স্থানে বিভাগ ক্রমে বিন্যাস করিয়া প্রকাশ করিব। প্রকাশ করার ফল অন্য কিছু হউক, বা না হউক, অন্তত আর্য্যদিগের অনুসন্ধান ও দূরদর্শিতার ইয়ত্তা কত দূর, তাহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত হইব।

অপিচ, যদিও আর্য্যেরা নীতি-গত বৈলক্ষণ্য অনুসারে নীতি শাস্ত্রগুলি বিভাগ করিয়া নির্ম্মাণ করেন নাই; না করিলেও বক্তব্য বাক্যের লক্ষ্য ও ফলভেদ দৃষ্টে আমরা বিভাগ করিয়াই বলিব।

নীতি সমুদায়ের চারিটি মাত্র শ্রেণী করা যাইতে পারে। রাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি, সামাজিক নীতি ও সাধারণ নীতি। রাজনীতির লক্ষ্য রাজা—ধর্ম্ম-নীতির লক্ষ্য ধর্ম্ম—সামাজিক-নীতির লক্ষ্য সমাজ—আর সাধারণ নীতির লক্ষ্য সাধারণ অর্থাৎ রাজা, ধর্ম্ম, সমাজ। তবে উক্ত নীতিত্রয়ের সহিত সাধারণ নীতির প্রভেদ কি?—জগতের পরিবর্ত্তন সহকারে নীতি সকলের বলাবল ও দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনায় নীতি প্রয়োগ ফলাফল এই সকল বলাই সাধারণ নীতির লক্ষ্য এইমাত্র প্রভেদ। লক্ষের ভিন্নতা অনুসারে নীতির ভিন্নতা স্বীকার অন্যায্য নহে।

যে উদ্দেশে এত দূর বলা হইল, সেই উদ্দেশ্য সম্প্রতি নিকট হইল। আমরা বিভাগ ক্রমে আর্য্যজাতীয় নীতিশাস্ত্র প্রকাশে উদ্যুক্ত হইয়া প্রথমত রাজনীতি প্রকরণ বলাই উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাই সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

নীতি-শাস্ত্রের লক্ষণ।

"নয়স্য বিনয়ো মূলং বিনয়ঃ শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ।
বিনয়ো হীন্দ্রিয়জয়স্তদ্যুক্তঃ শাস্ত্রমিচ্ছতি।"

বিনয়ই নীতির মূল। বিনয় কি? না পশুবৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অধীন না হওয়া, অতএব শাস্ত্রোপদিষ্ট পথ অনুসরণ করার নাম বিনয়; যে শাস্ত্র দ্বারা বিনীত হওয়া যায় তাহারই নাম নীতি-শাস্ত্র।

"আত্মানং প্রথমং রাজা বিনয়েনোপপাদয়েৎ।
ততোঽমাত্যাংস্ততো ভৃত্যান্ ততঃ পুত্রাংস্ততঃ প্রজাঃ"।

রাজা অগ্রে আপনাকে বিনীত করিবেন, পশ্চাৎ আমাত্যবর্গকে বিনীত করিবেন, তৎ পশ্চাৎ ভৃত্যবর্গ এবং প্রজাবর্গ যাহাতে বিনীত হয় তাহা করিবেন।

"সদানুরক্তপ্রকৃতিঃ প্রজাপালনতৎপরঃ।
বিনীতাত্মা হি নৃপতির্ভূয়সীং শ্রিয়মশ্নুতে।"

রাজা অমাত্যগণের প্রতি অনুরক্ত হইবেন, অমাত্যেরাও যাহাতে অনুরক্ত হয়, তাহা করিবেন। পরে সর্ব্ব প্রজা রক্ষায় যত্ন করিবেন (তাহা হইলে রাজার নিজ আত্মাকে এক প্রকার বিনীত করা হইল।)

"যথেন্দ্রিয়াণি নৃপতির্বিষয়াণাং পরিগ্রহে।
স্ববশ্যানি প্রকুর্ব্বীত মনোজ্ঞানং দৃঢ়ন্তথা॥"

রাজা ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া বিষয় (ভোগ্য বস্তু) গ্রহণে নিযুক্ত করিবেন এবং মন ও জ্ঞান যাহাতে দৃঢ় থাকে তাহা করিবেন।

"জ্ঞানে দৃঢ়ে কশায়াং বা দৃঢ়ায়াং নৃপসত্তম।
সারথিঃ স্ববশোঽদান্তানীশঃ প্রেরয়িতুং হয়ান্॥"

জ্ঞান বা কশা দৃঢ় থাকিলে ও সারথি স্ববশে থাকিলে, (১) তদ্দ্বারা অদান্ত অশ্বগণকেও পরিচালনা করা যায়। অতএব,—

"অতো নৃপঃ স্বেন্দ্রিয়াণি বশেক্কৃত্বা মনস্তথা।
জ্ঞানমার্গমধিষ্ঠায় প্রকুর্ব্বীতাত্মনো হিতম্॥"

রাজা, অগ্রে আপনার ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিবেন ও মনকে দৃঢ় করিবেন, পশ্চাৎ জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করিয়া আপনার হিত সাধন করিবেন।

"ভোক্তব্যং স্বেচ্ছয়া ভূপো ন কুর্য্যাদুৎপথেরিতম্।
দ্রষ্টব্যমিতি দ্রষ্টব্যং ন দ্রষ্টব্যঞ্চ স্বেচ্ছয়া॥"

রাজা, আপনার ইচ্ছানুরূপ ভোগোপভোগ করিবেন কিন্তু উৎপথগামী হইবেন না। উৎপথগামী হইয়া কিছুই করিবেন না। যাহা দেখিবার যোগ্য তাহাই দেখিবেন, নচেৎ ইচ্ছা হইল বলিয়া দেখিবেন না।

"শ্রোতব্যমিতি শ্রোতব্যং নাধিকং শ্রবণঞ্চরেৎ।
শাস্ত্রতত্ত্বযুতে ধীরঃ শ্রুতিবশ্যোভবেন্নহি॥"

যাহা শুনিবার যোগ্য, (২) ধীর ব্যক্তি তাহাই শুনিবেন। অধিক শ্রবণ করিবেন না। যদ্যপি অধিক শুনিতে হয়, তবে তাহা শাস্ত্র-তত্ত্ব-ঘটিত বিষয়, যেহেতু শাস্ত্রতত্ত্ব শ্রবণ ব্যতিরেকে শ্রোত্র বশ হয় না।

"এবং ঘ্রাণং ত্বচং বাপি বশীকৃত্যেচ্ছয়া নৃপঃ।
স্বেচ্ছয়ৈবোপভুঞ্জীত নোদ্দামং বিষয়ং ব্রজেৎ।"

ঐরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, স্পর্শ জ্ঞান-সাধক ত্বগিন্দ্রিয়কেও বশীভূত করিবেন। ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া যথেচ্ছ বিষয় সম্ভোগ করিবেন। কদাচ নিরঙ্কুশ হইয়া বিষয় সেবা করিবেন না। (এতাবতা ইন্দ্রিয় প্রীতির নিমিত্ত ব্যসনী হইবে না)।

"এবং যদি ভবেদ্রাজা তদা সম্যার্জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জিতেন্দ্রিয়ত্বে হেতুশ্চ শাস্ত্রবৃদ্ধোপসেবনম্।"

রাজা যদি কথিত প্রকার সাধন-সম্পন্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যাইবে (জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণই এই। অনেকে মনে করেন যে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নিবৃত্তি করার নাম ইন্দ্রিয় জয়, বস্তুত তাহা নহে) বহুতর শাস্ত্রের আন্দোলন ও

(১) অথবা "সারথিঃ স্ববশো দান্তানীশঃ প্রেরয়িতুং হয়ান্।" জ্ঞান দৃঢ় থাকিলে, মন দৃঢ় থাকিলে ও ইন্দ্রিয় স্বরূপ অশ্ব সকল সুদান্ত (সুশিক্ষিত) হইলে, তবেই উত্তম রূপে অশ্বের পরিচালনা হইতে পারে, হয়-প্রেরণা উত্তম হইলে উৎপথে পতিত হইতে হয় না।

(২) কোন্‌টি যোগ্য কোন্‌টি অযোগ্য, তাহা দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় নির্ণয় করিতে হয়।

বহুদর্শি সাধু পুরুষের সঙ্গ, এই দুইটি জিতেন্দ্রিয়তা সম্পাদনের পথ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আর্য্য বংশের আদি ধর্ম্ম।

আর্য্য বংশের পূর্ব্ব পুরুষগণ আদি বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের আদিম ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আদিম ধর্ম্মও লইয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য আর্য্য বংশীয় বিভিন্ন ও পরস্পর দূরবিচ্ছিন্ন জাতিগণের প্রাচীন আদিভূত উপাসনা পদ্ধতি এবং ঈশ্বর ও দেবতা বাচক শব্দ সমূহের সাদৃশ্য ও প্রকৃতিগত অভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ এবং গ্রীক্, রোমক, জর্ম্মণ ও কেল্‌টিক জাতি, ইহারা সকলেই পূর্ব্ব কালে একবিধ দেবতার অর্চ্চনা করিত। সংস্কৃতে দেব ও দ্যৌ শব্দ, লাটিনে ডীয়স্ এবং গ্রীক্ ভাষায় জীয়স্, জর্ম্মণ ভাষায় জীয়ো—এই সমস্ত একই শব্দের রূপ ভেদ মাত্র এবং সেই শব্দের ধাত্বর্থ দীপ্তি বাচক। সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, জগতের জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকল আর্য্য বংশের আদি পুরুষগণের প্রথম আরাধনার বিষয় ছিল এবং ইতিবৃত্তে বাস্তবিক তাহাই দৃষ্ট হয়। কি হিন্দু, কি গ্রীক্, কি জর্ম্মণ ইহারদিগের যে সকল পুরাকালিক উপাস্য দেবতার নামোল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদায়ই প্রায় সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, উষা, অগ্নি ইত্যাদি নৈসর্গিক জ্যোতিষ্ক পদার্থ সমূহের নামান্তর মাত্র। প্রাতঃকালের যে পবিত্র অরুণ কিরণ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন জগৎকে আলোকিত ও চেতন বিশিষ্ট করিয়া দেয়, সেই সুনির্ম্মল জ্যোতি প্রভাবেই মনুষ্য-জাতির আদি পুরুষগণের হৃদয়স্থিত প্রগাঢ় গভীর ধর্ম্ম ভাবের প্রথম উদ্দীপন হইয়াছিল। ঈশ্বরের পবিত্রতা ও মহিমার প্রতিকৃতি স্বরূপ সেই ভৌতিক জ্যোতিকে অবলম্বন করিয়া সেই জ্যোতির জ্যোতি পরম পুরুষের প্রথম নাম রচিত হইয়াছিল (১)।

বাস্তবিক জগন্মণ্ডলের জ্যোতির্ম্ময় ভৌতিক পদার্থ সকল মনুষ্য হৃদয়কে সর্ব্বাগ্রেই আকৃষ্ট করে। নবোদিত অরুণের অপূর্ব্ব নয়ন-রঞ্জন শোভা, মধ্যাহ্ন তপনের প্রখর রশ্মি ও প্রচণ্ড প্রতাপ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক অসীম আকাশের উজ্জ্বল শুভ্র দ্যুতি—এই সমস্ত আদিম মনুষ্যের সরলচিত্তে অত্যদ্ভুত অভাবনীয় বিস্ময়কর অলৌকিক ব্যাপার রূপে প্রতীয়মান হইয়া অন্তঃকরণে উন্নত সংসারাতীত আধ্যাত্মিক চিন্তা সকলের উদ্বোধন করিয়া দেয়। এই রূপে মনুষ্যের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজনা হইলে প্রথম কল্পে সূর্য্য চন্দ্রাদি সুমহৎ ও প্রভাবশালী ভৌতিক পদার্থ সকলকে দেবতা রূপে লোকে আরাধনা করিতে আরম্ভ করে। পরে জ্ঞান চিন্তা-শক্তি ও ধর্ম্ম-বুদ্ধির ক্রমোন্মেষ সহকারে সেই সূর্য্য চন্দ্রাদি দেবগণের অধিদেবতা এক মাত্র জগদাত্মা পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই আরাধনা শ্রেষ্ঠ কল্প এবং অন্যান্য দেবতাগণের অর্চ্চনা নিকৃষ্ট কল্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়,—ইহাই মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবস্থা।

এই রূপে মনুষ্যের ধর্ম্ম ভাবের প্রথম বিকাশ সহকারে, আদি কবি ও ঋষিগণের মুখ বিনিঃসৃত তৎকালোচিত জীবন্ত সরল সাধু-ভাব-ব্যঞ্জক দেব-স্তুতি ও ধর্ম্মোপদেশ বাক্য সকল ভক্তি ভাবে সংকলিত ও পুরুষ পরম্পরায় প্রচলিত এবং অভ্যস্ত হইয়া, তাহাই ধর্ম্ম বিষয়ে একান্ত শ্রদ্ধেয় ও প্রামাণিক স্বরূপে

(১) God is Light and in him there is no darkness at all.

St: John's Epistles.

পরিগৃহীত হয়। কিন্তু কাল ক্রমে পূর্ব্বতন কবি ও ঋষিদিগের বাক্যের প্রকৃত ভাবার্থ বিলুপ্ত বা অস্পষ্ট হইয়া যায়। লোকে সেই সকল বাক্যের রূপক ঘটিত ভাবার্থ বা কবিত্ব-রস-গর্ভ আভাস গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, তৎশব্দার্থ মাত্র গ্রহণ বা তাহাতে কাল্পনিক অর্থ আরোপ করিতে আরম্ভ করে। তখন পৌরাণিক দেব-চরিত্র সমূহ এবং অশেষবিধ উপধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মধ্যে বেদ সংহিতা, উপনিষৎ এবং পুরাণ এই ত্রিবিধ গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে উপরোক্ত ধর্ম্মের তিনটি আকৃতির অতি সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈদিক আদি কবিগণের চিত্তে এই পরিদৃশ্যমান জগতের তেজোময় ভৌতিক পদার্থ সকল যে কি রমণীয় আশ্চর্য্য ভাবের উদ্বোধক হইত, তাহা এক্ষণে আমরা সম্যক প্রকারে অনুভব করিতে পারি না। তাঁহারা প্রকৃতির বিচিত্র সুন্দর মূর্ত্তি যতই আলোচনা করিতেন, ততই যেন তাঁহাদের হৃদয়ের অননুভূত-পূর্ব্ব নব নব ভাব সকল উচ্ছ্বসিত হইয়া অনায়াস-সমুৎপন্ন সুমধুর ছন্দোবন্ধে অনর্গল ভাবে বিনিঃসৃত হইত। তেজোময় অসীম আকাশ, অতুল-প্রভ জগৎ প্রকাশক জ্যোতির্ম্মণ্ডল সূর্য্য, নিশান্ধকার নাশিনী মধুর দ্যুতি বিচিত্র চারু উজ্জ্বল বর্ণা-উষা, পবিত্র-শিখ, তেজঃপুঞ্জ অগ্নি, এই সকল তেজস্বী, অপ্রতিহত-শক্তি-বিশিষ্ট ও জীবের মঙ্গলদায়ক প্রাকৃতিক পদার্থকে ঋষিগণ চৈতন্য বিশিষ্ট ও দেবতাত্মা স্বরূপে জানিতেন। প্রতি দিন সূর্য্যোদয় হইতেছে, দিবারাত্র, শীত গ্রীষ্ম পর্য্যায়ক্রমে অবিচলিত নিয়মে গমনাগমন করিতেছে, এই সকল এক্ষণে আমাদের মনে প্রগাঢ় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না ও তদ্দ্বারা গম্ভীর ধর্ম্মভাব বা রমণীয় প্রীতি ভাব, অথবা কবিত্ব রসের সঞ্চার সচরাচর হয় না। কিন্তু বৈদিক আদি কবিগণের অশিক্ষিত সরল চিত্তে, এই সকল ব্যাপার নিতান্ত অভাবনীয় সাতিশয় বিস্ময়কর ও অতি নিগূঢ় মহতী শক্তি প্রকাশক বলিয়া প্রতীয়মান হইত। দিবাকর পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হইলে সমস্ত জগৎ যখন অন্ধকারাবৃত হইত, তখন তাঁহাদের প্রথম উন্মেষোন্মুখ বুদ্ধিতে আমাদের ন্যায় তাঁহারা কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেন না, যে সূর্য্য পুনরায় উদিত হইবে এবং ঘোর তমসাচ্ছন্ন জগৎ পুনরায় আলোকিত ও প্রকাশিত হইবে। সুতরাং দিবাবসানে তাঁহারা সংশয়যুক্ত চিত্তে ভীত মনে জিজ্ঞাসা করিতেন, "সূর্য্যদেব কি পুনরুত্থান করিবেন! আমাদের চির সুহৃৎ উষা কি আবার প্রকাশ পাইবেন! তমোরূপী দস্যুগণকে কি প্রখর কর প্রভাকর নিধন করিবেন!" পরে পুনরায় রাত্রি প্রভাত কালে যখন নভোমণ্ডলের পূর্ব্ব দিক্ অপূর্ব্ব সুন্দর রাগে রঞ্জিত হইত এবং সূর্য্যদেবের উদয় সূচক সুমধুর জ্যোতিঃছটা অম্বর তলে বিস্তার পূর্ব্বক উষার আবির্ভাব হইত, তখন বৈদিক কবিগণ কেমন সোৎসুক চিত্তে পূর্ব্ব দিগভিমুখে বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া কিরণমালায় বিভূষিত দিনমণির উদয় প্রতীক্ষা করিতেন। তখন তাঁহাদের অবসন্ন হৃদয় পুনরাশ্বাসিত ও পবিত্র আনন্দ রসে প্লাবিত হইয়া সেই উষাদেবী এবং অরুণ দেবের মহিমা কীর্ত্তন করিত। সেই পূর্ব্বতন ঋষিগণের হৃদয়োত্থিত নব নব ভাবের আবির্ভাব হেতু তদীয় তৎকাল-প্রণোদিত চিত্ত বৃত্তির ভাব কথঞ্চিৎ যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারাই সেই আদি কবিদিগের মুখ বিনির্গত বেদ বাক্যের গাম্ভীর্য্য ও কবিত্বরসের প্রকৃত স্বাদুতা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন।

সমুদায় প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে প্রাতঃকালের পূর্ব্ব-দিক্-শোভি প্রশান্ত-জ্যোতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণা উষার আবির্ভাবের ন্যায় অপূর্ব্ব রমণীয় ও হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য আর কিছুই নাই। প্রকৃতির পবিত্র মধুর মূর্ত্তি এই সময়ে আমাদের হৃদয় পটে প্রতিভাত হয়, এই সময়ে অন্তঃকরণের পবিত্র উন্নত সংসরাতীত ভাব সকল আপনা হইতেই উত্থিত হয়। সুতরাং আর্য্য ঋষিগণের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রথম উদ্বোধনে প্রকৃতির এই অমৃতময় পবিত্র মূর্ত্তির আরাধনা এক প্রকার নিসর্গোৎপন্ন হইবেক। বেদে উষার আরাধনা অতি বাহুল্য রূপে দৃষ্ট হয় এবং উষার আবির্ভাবকে বৈদিক কবিগণ রূপকচ্ছলে নানা প্রকারে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

প্রাতঃকালের প্রথম প্রকাশিত কিরণজালে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত হইলে পূর্ব্বদিকস্থ বিচিত্র-বর্ণ মেঘ-মালা ক্রমে ক্রমে সঞ্চালিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে; এই মনোহর দৃশ্যকে বৈদিক কবিগণ কল্পনা শক্তি প্রভাবে এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন;—"স্বর্গের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল, উষার শুভ্রবর্ণা গোযূথ আস্তে আস্তে তমোময় গোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রশস্ত চারণ ক্ষেত্রে গিয়া বিচরণ করিতেছে।" "চির যৌবনা মধুর মূর্ত্তি চারুহাসিনী উষাদেবী উদিত হইয়া সকলের গৃহে প্রবেশ করত নিদ্রাভিভূত জনগণকে জাগরিত ও তাহাদের স্বস্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত করিয়া দেন"(২)। এই মত বহুবিধ রূপকচ্ছলে সূর্য্যোদয়ের বর্ণনা দৃষ্ট হয়।

"পিতা যেমন নব প্রসূত সন্তানের মুখাবলোকনার্থ আগ্রহাতিশয় চিত্তে অপেক্ষা করেন, সেই রূপ বৈদিক কবিগণ গাঢ়ান্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির প্রতি এই জন্য প্রতীক্ষা করেন যে, সে আপন তনয় দিবা-প্রকাশক অরুণকে প্রসব করিবে।" প্রাতঃকালে উদিতপ্রায় তরুণ তপনের কিরণ ছটা বেগ সহকারে গগণ মার্গে যুগপৎ ধাবিত হইয়া দিগন্ত ব্যাপী হয় এবং তদব্যবহিত পশ্চাদ্বর্ত্তি সেই তেজোময় রশ্মিধারী দিবাকর প্রকাশিত হইয়া আকাশ পথে গমন করেন; এই নৈসর্গিক ব্যাপার অবলম্বনে কবিজন-চিত্ত-সুলভ কল্পনা বলে বৈদিক ঋষিগণ সূর্য্যদেবকে বীর্য্যবন্ত দ্রুতগামী অশ্ব সংযোজিত রথারূঢ় এবং অম্বর ক্ষেত্র বিহারী দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রশান্ত সূর্য্যোদয় কালে প্রকৃতির পবিত্র মন্দিরে সেই স্বর্গীয় জ্যোতির আদর্শ স্বরূপ প্রজ্বলিতাগ্নি স্থাপনান্তর ঋষিগণ তাঁহাদের পৌর্ব্বাহ্নিক আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন(৩)। সেই উপাসনার উদ্বোধন বাক্য কি সরল স্বাভাবিক ভাব গর্ভ!—"উত্থান কর! আমাদের জীবন, আমাদের চেতনা পুনরাগত হইয়াছে, অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছে ও জ্যোতিরালোকের উদয় হইতেছে।"

প্রাতঃ সূর্য্যোদয় যেমন হৃদয়ের উন্নত ভাবোদ্দীপনের একটি প্রশস্ত কাল, সেইরূপ সন্ধ্যার মোহন মূর্ত্তি বৈদিক ঋষিগণের সরস চিত্তকে আকর্ষণ করিতে ত্রুটি করে নাই। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য জীবনের অচিরস্থায়ী ভাব তাঁহাদের মনে উদয় হইত। সূর্য্যদেব যেমন দিনমানে অতিশয় তেজ সহকারে বিরাজমান হইয়া পরিশেষে পশ্চিমাকাশ পথে অদৃশ্য হন, তাঁহাদের

(২) গৃহং গৃহং অহনা যাতি অচ্ছ দিবে দিবে অধি নাম দধানা সিসাসন্তী দ্যোতনা শশ্বৎ আ-অগাৎ অগ্রং অগ্রং ইৎভজতে বসূনাং।

অহনা (উষা) প্রত্যেকের গৃহের নিকট উপস্থিত হন, তিনি প্রত্যেক দিনকে প্রকাশ করেন, সেই দ্যোতনা সর্ব্বদা সর্ব্বাগ্রে সকল উপাদেয় উপভোগ করেন।

(৩) অগ্নিং উষসং অশ্বিনং দধিক্রাং বিষ্ণুয়ু হবতে বহ্নিঃ উক্‌থঃ।

প্রাতরাগমে স্তোতা তদীয় উকথ সহকারে অগ্নি উষা অশ্বিন দধিক্রাকে আহ্বান করেন।

পিতৃগণ সেই রূপ মরণান্তে পশ্চিম বাসী যম ও বরুণের সহিত পিতৃ লোকে গমন করেন। দিবাবসানকে জগতের প্রলয় সূচক মনে করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ জীবনের অস্থায়িত্ব ও জগতের বিনাশকে অপেক্ষা করিয়া শঙ্কাযুক্ত মনে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেবকে সকরুণ বাক্যে ঐকান্তিক চিত্তে অর্চ্চনা করিয়া তদীয় স্থানে এই প্রার্থনা করিতেন যে, "হে জ্যোতির্ম্ময় দেব! তুমি পুনরাগমন করিয়া এই নিদ্রাগত তমোভূত জগৎকে পুনরুত্থান করিও।" সায়ং সন্ধ্যার ন্যায় ঋষিগণ প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্ন কালে উপাসনা করিতেন,এই রূপ ত্রৈকালিক উপাসনার পদ্ধতি অতি প্রাচীন কালাবধি প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়।

সূর্য্য ও উষার বিভিন্ন নাম হইতেই অধিকাংশ বৈদিক দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে। বিষ্ণু, বৃহস্পতি, বসু, অর্য্যমা, অরুণ ও আদিত্য এই সকল আদৌ সূর্য্যেরই তেজোময় মূর্ত্তি বিশেষ মাত্র ছিল, সুতরাং এই সকল দেবতার যে সমস্ত শক্তিও প্রকৃতির বর্ণনা আছে, তাহা সূর্যাদেবেরও প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু সূর্য্যের এই সকল স্বতন্ত্র নাম কালক্রমে স্বতন্ত্র দেবতা রূপে পরিণত হইয়াছে। এই রূপে অহনা সরমা দহনা অরুষী ইত্যাদি নাম উষারই নামান্তর মাত্র ছিল,পরে প্রত্যেক নাম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা বাচক হইয়াছে।

কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্য জাতি-সাধারণের উপাস্য দ্যৌঃ নামক সর্ব্ব-প্রাচীনতর দেবতার নাম ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। দ্যৌঃ-শব্দের প্রকৃতার্থ উজ্জ্বল আকাশ। অতএব দ্যৌঃ শব্দে এই আলোকময় উজ্জ্বল অসীম আকাশের দেবতা, সেই দেবতাকে ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দ্যৌঃ পিতা রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্যৌঃ পিতঃ পৃথিবী মাতঃ অধ্রুক্।
অগ্নে ভ্রাতঃ বসবঃ মৃড়তা নঃ। ঋগ্বেদ৬মণ্ডল-৫১-৫।

হে দ্যৌঃ পিতঃ হে পৃথিবি মাতঃ হে অগ্নে ভ্রাতঃ হে বসুগণ আমাদের প্রতি কৃপা কর।

অন্যত্র "দ্যৌঃ পিতা জনিতা" এবং "দ্যৌ ইন্দ্রের স্রষ্টা ও জনিতা" বলিয়া উল্লিখিত আছে। বাস্তবিক বৈদিক ঋষিগণ যাঁহাকে দ্যৌঃ পিতা বলিতেন, রোমক জাতি তাঁহাকেই যুপিতর ও গ্রীকগণ জীয়স্ নামে পূজা করিত (৪)। আর্য্য বংশীয় অন্যান্য জাতিগণের মধ্যে এই দেবতার প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মে দ্যৌঃ পুত্র ইন্দ্রই দেবতাগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎ স্বিৎ ইন্দ্রঃ অধ্যেতি মাতুঃ।
কিয়ৎ পিতুঃ জনিতুঃ জজানঃ। ঋগ্বেদ ৪ম-১৭-১২।

ইন্দ্র তম্মাতা (পৃথিবী) ও তৎ পিতা (আকাশ) ইহাতে শ্রেষ্ঠ।

ইন্দ্রায় হি দ্যৌঃ অসুরঃ অনম্নতঃ।
ইন্দ্রায় মহী পৃথিবী বরীমভি। ঋগ্বেদ ১ম-১৩১-১।

যদিও বেদে দ্যৌঃ-পিতার আরাধনা ক্রমে লোপ হইয়াছিল, বৈদিক ঋষিগণ তাঁহারই স্থলে ইন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক দ্যৌঃ-পিতা হইতেই ইন্দ্রের উৎপত্তি, সেই দেবতার ন্যায় ইন্দ্র আলোক-পূর্ণ স্বর্গাধিপতি ও বজ্রধারী, মেঘ ও বৃষ্টির সৃজন কর্ত্তা ও প্রেরয়িতা রূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে আর্য্য ঋষিগণের প্রাথমিক ধর্ম্মের উৎপত্তির পরিচয় বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঋষিগণ কি সাংসারিক কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার প্রয়োজনের নিমিত্ত এই সকল দেবতার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহারা সকল প্রকার সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতেন, দেবতা-

(৪) গ্রীক্‌দিগের আদি কবি হোমরের বর্ণনানুসারে জীয়স্ শক্তি ও মহিমাতে সকল দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি মনুষ্য ও দেবতা সকলের নিয়ন্তা। তিনি বৃষ্টি ও বজ্রাগ্নি প্রেরণ করেন। তাঁহার আদেশ কোন দেবতা লঙ্ঘন করিতে পারেন না।

গণই তাহার সাক্ষাৎ বিধান কর্ত্তা; দেবতাগণের অনুগ্রহ না থাকিলে তাঁহাদের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। যুদ্ধে দেবতারাই তাঁহাদের সহায় হইয়া শত্রু বর্গকে নিধন করেন, এই জন্যই তাঁহারা অগ্রে ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা না করিয়া কোন সংগ্রামে অথবা অন্য কোন গুরুতর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতেন না এবং যুদ্ধে জয়ী হইয়া সর্ব্ব প্রথমে মহা উল্লাস সহকারে ভক্তি ভাবে দেবতাদিগের স্তুতি পাঠ ও আরাধনা করিতেন। দেশে অনাবৃষ্টি অথবা অন্য কোন অমঙ্গল জনক ব্যাপার ঘটিলে ঋষিগণ বৃষ্টি পতন ও অমঙ্গলের প্রতিবিধান জন্য ইন্দ্র ও অপরাপর দেবতাগণের উপাসনা এবং তদুদ্দেশে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন। বেদে যজ্ঞানুষ্ঠান করার প্রধান উদ্দেশ্য দেব-পূজা। সকল দেবতার প্রতিমা স্বরূপ পবিত্র অগ্নিকে কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদন ও মন্ত্রপূত করিয়া তাহাতে আরাধ্য দেবোদ্দেশে মন্ত্র ও স্তুতি পাঠ সহকারে দেবতার তৃপ্তির নিমিত্ত ঘৃত, মাংস ও অন্যান্য আহারীয় দ্রব্যাদি নিক্ষেপ করিতেন এবং অগ্নি দ্বারা সেই আহার্য্য দ্রব্য সমূহ দেবতারা প্রাপ্ত হইতেন ও তদ্ উপভোগে সন্তোষ লাভ করিতেন। এইরূপে আর্য্য সমাজের অতি শৈশবাবস্থা হইতেই দৈব-নিষ্ঠা ও একান্ত ধর্ম্ম পরায়ণতার আশ্চর্য্য পরিচয় বেদের সকল স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদ-সংহিতায় যদিও ভৌতিক শক্তির উপাসনাই বহু বাহুল্য রূপে দৃষ্ট হয়, তথাপি বৈদিক ঋষিগণ সকল দেবাধিদেব এক মাত্র জগৎ স্রষ্টার জ্ঞান হইতে বিচ্যুত ছিলেন এমত কদাচ বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

ঋষিগণ যদিও দেবগণের মধ্যে কাহাকে জ্যেষ্ঠ, কাহাকে কনিষ্ঠ, কাহাকে পুরাতন, কাহাকে নুতন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যখন যে দেবতার আরাধনা করিতেন, তখন তাঁহাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব শক্তিমান রূপে ধ্যান ও পূজা করিতেন। তৎকালে তাঁহাকে অপর দেবতার সহিত তুলনা বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট রূপে ভাবনা করিতেন না।

মহর্ষি মনুপ্রোক্ত একটি ঋকে এই প্রকার কথিত হইয়াছে,—"হে দেব-সকল তোমাদের মধ্যে কেহ ক্ষুদ্র বা কেহ কনিষ্ঠ নাই, তোমরা সকলেই তুল্য রূপে মহান্।" এই ভাবটি সমস্ত বৈদিক উপাসনার অন্তঃসার রূপে প্রত্যক্ষ হয়। ঋষিগণ যখন অগ্নির উপাসনা করিতেন, তখন অগ্নির বিশ্বনিয়ন্তা লোকেশ, সুধীনৃপ, মনুষ্যের পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু রূপে সম্বোধন করিয়া তদীয় অর্চ্চনা করিতেন। অন্য স্থানে যখন ইন্দ্রের স্তুতিবাদ করা হইয়াছে, তখন তাঁহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেব, মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত, জগতের রক্ষক ও প্রতিপালক স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আর এক স্থলে কোন ঋষি বরুণ দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "হে দেব! তুমি সকলের অধিপতি, স্বর্গ মর্ত্ত্যের অধীশ্বর, কি দেবতা কি মনুষ্য সকলেরই তুমি রাজা"। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরের ভাব সূচক ইহাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও বীর্য্যবন্ত বাক্য আর কি হইতে পারে। অতএব বিভিন্ন নাম ও রূপ বিশিষ্ট দেবগণের উপাসনার মধ্যেও ঈশ্বরের ভাব যে প্রথম হইতেই অস্ফুট রূপে উদ্ভাবিত হইয়া ক্রমেই প্রস্ফুটিত হইতেছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়। বৈদিক উপাসনা যদিও প্রাধান্য রূপে নৈসর্গিক শক্তির উপাসনা বটে, কিন্তু তাহাকে নিরীশ্বর উপাসনা বলা যাইতে পারে না। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে এই কথাটি দৃষ্ট হয়, যে "লোকে তাঁহাকে ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি নামে উল্লেখ করে, কেহ বা তাঁহাকে সুপর্ণা দিব্য গরুত্মৎ বলিয়াছেন। যাহা বস্তুত

এক, সুধীগণ তাহাকে নানা রূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নাম তৎপ্রতি আরোপ করেন"। পুনশ্চ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে লিখিত আছে "সুবিজ্ঞ কবিগণ সেই একমাত্র শোভন-পর্ণকে বাক্যচ্ছলে নানা রূপে প্রকাশ করেন।" পরিশেষে দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে এই সুস্পষ্ট মহাবাক্যটি দৃষ্ট হয়।

"যোদেবেষু অধিদেব এক আসীৎ"।

মনুষ্যের প্রকৃত ধর্ম্মভাব এক বার হৃদয়ে উত্তেজিত ও প্রবুদ্ধ হইলে সর্ব্বস্রষ্টা সকলের বিধাতা পরম পুরুষকে জানিবার জন্য যে আত্মা আপনা হইতেই আগ্রহান্বিত হয়, তাহা ঋগ্বেদ নিহিত ঋষি বাক্য সকলে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

আয় ব্যয়।

পৌষ ও মাঘ ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১২০৪ ॥৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৭৮ ৶০
সমষ্টি	১৪৮২ ৸৶১০
ব্যয়	৯১০ ।৶০
স্থিত	৫৭২ ।৶১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭৫১ ।/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০০ ।০
পুস্তকালয়	১১২ ॥৵০
যন্ত্রালয়	১০৮
গচ্ছিত	১৩২ ।৶১৫
সমষ্টি	১২০৪ ॥৶১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৫৫ ৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩২৭ ।৶১০
পুস্তকালয়	৫৫ ৸০
যন্ত্রালয়	২২০ । ১০
গচ্ছিত	৫১ ৶৶ ৫
সমষ্টি	৯১০ ।৶০

দান প্রাপ্তি।

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০০
" গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫০
" জানকীনাথ ঘোষাল ...	৫০
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	১০
" হরিমোহন রায় ...	১০
" কৃষ্ণলাল মৈত্র	১০
" হরিমোহন নন্দী ...	১০
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য ...	১০
শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র নন্দী ...	১০
" ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় ...	১০
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ...	১০
" বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫
" বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য ...	৫
" রাজারাম মুখোপাধ্যায় ...	৫
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৫
" শিবচন্দ্র দেব ...	৫
" ব্রজনাথ ধর ...	৪
" কাশীনাথ দত্ত ...	৪
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	৪
" শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৪
" শ্রীনাথ মিত্র ...	৩
" হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩
" মণিলাল মল্লিক ...	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ...	২
" কার্ত্তিকচরণ মল্লিক ...	২
" হরকুমার সরকার ...	২
" ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ..	২
" দেবেন্দ্রদেব দাস ...	২
" ভূমেশচন্দ্র বসু ...	২
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক ...	১
" আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ...	১
" মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ...	১
" বনমালি চন্দ্র ...	১
" ভোলানাথ সেন ...	১
" কৃষ্ণদয়াল রায় ...	১
" কালীনাথ বসু ...	১
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ...	১
" ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ...	১
" ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ...	১
" অনন্তরাম বসু ...	১
" গুণমাধব রায় ..	১
" গুরুচরণ মিত্র ...	১
" মহানন্দ মুখোপাধ্যায় ...	॥০
" অম্বিকাচরণ বসু ...	॥০
" যদুনাথ বিশ্বাস ...	॥০
	৫২৬॥০

একক্কালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৪। ১৫
" ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫
	৮৯। ১৫

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন চৌধুরি ...	২৫
" হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	২
	৩৭
দানাধারে প্রাপ্ত	১৮৸৶০
কোং কাগজের সুদ ...	৭৯॥৵০
	৭৫১।/১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।